রাণী ভবানী

॥ শ্রীচিত্রগুপ্ত ॥

সিটি বুক এজেন্সী
প্রকাশক : পরিবেশক
৫৫, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ ১৩৬৫

প্রকাশক

পি, দে

৫৫, সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট

কলিকাতা-৯

মুদ্রক—

সরোজ কুমার রায়

শ্রীমুদ্রণালয়

১২সি, শঙ্কর ঘোষ লেন

কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট—

জয়দেব দাস

শ্রদ্ধেয়

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র দত্ত

মহাশয়কে

● লেখকের অন্যান্য বই ●

মুক্তপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

বাদশা বেগম নফর

Rani Bhawani

A life sketch by
Srichitragupta

—এক—

হুমব্রো—হুমব্রো—হুমব্রো—

নাটোর রাজসরকারের তাঞ্জাম চলেছে,—ডাক উঠছে ষোল কাহারের গলায়। আগে বরকন্দাজ, পিছে পাইক।

ষোল কাহারের তাঞ্জাম, গোধূলির আলোয় ডুবে ছুটে চলেছে না যেন পেখম ছড়িয়ে উড়ে যাচ্ছে সাতরঙ্গা পাখি মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে। রংয়ের বাহার খুলেছে নরম আলোর লাল-রংয়ে।

তাঞ্জাম যাবে ছাতিনা গাঁয়ে, আত্মারাম চৌধুরীর বাড়ি।

নবাব আলিবর্দির আমল। ইংরাজ তখনও নবাব সরকারে নজরানা দেয়, দরবারে যেয়ে সেলাম করে। কুঠি করেছে মুর্শিদাবাদ, পাটনা, বালেশ্বর, কলকাতা, হুগলি। লেন-দেন করে, ব্যবসায়ীর জাত। এক আনা দেয় তো ষোল আনা বুঝে নেয়।

দেশে শাসন আছে শান্তি নাই। শৃঙ্খলা আছে বাঁধন নাই। নবাব সরকার খেয়াল খুশির সরকার। মুখের কথায় আইন—বাঁচা-মরা নবাবের মর্জি। রাজা রামজীবনের জমিদারি নাটোরে নাটোরও বলতে পার রাজসাহীও বলতে পার। রামজীবন রায়ের জমিদারির রাজসাহী জুড়ে। রামজীবনের রাজসাহীতে শান্তি আছে, শৃঙ্খলা আছে। নবাব সরকার খাজনা পায়। আপদে-বিপদে নবাবের পাশে থাকেন রামজীবন। নবাব সরকারে খ্যাতি আছে রাজার।

রামজীবনের দেওয়ান দয়ারাম,—দীঘাপাতিয়ার দয়ারাম। যেমন

রাজা তেমন কর্মচারি। নবাব সরকার পর্যন্ত খাতির করে দয়ারামকে। জমিদারির কাজে যাওয়া আসা করে দয়ারাম নাটোর থেকে মুর্শিদাবাদ—মুর্শিদাবাদ থেকে নাটোর। নবাব আলিবর্দির সঙ্গে পরিচয়টাও আলগা নয়, বেশ জড়িয়ে বাঁধা।

সেই দয়ারাম আছেন তাঞ্জামে।

রাজা রামজীবন রায়ের একটি মাত্র ছেলে—রামকান্ত।

আদুরে ছেলে, একটু জেদি। এমনি কিন্তু মাটির মানুষ—হাসিখুশি। বুদ্ধি বিবেচনাও ভাল। শরীরে দয়া-মায়া আছে। গুরুজনে ভক্তিশীল। গো-ব্রাহ্মণে সম্মান করে। রূপে-গুণে, বিদ্যা-বুদ্ধিতে উজ্জ্বল। দেহে আছে শক্তি, বুকে আছে সাহস। রাজা রামজীবনের ছেলে, নাটোরের রাজকুমার—বংশের উপযুক্ত।

ছেলের বয়স হয়েছে। রামজীবন ঘরে বউ আনবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। ডানা শক্ত হয়েছে, এবার মন করবে উড়্ উড়্। দাঁড়ে রাখতে হলে পায়ে শেকল বাঁধা চাই। শেকল না বাঁধলে কি পাখি দাঁড়ে থাকে?

শেকল?—সে কেমন শেকল চাই?—সোনার শেকল। আলোয় ঝিলিমিলি করবে। চোখ ধাঁধাঁবে, মন মাতাবে—হওয়া চাই খাঁটি সোনার, গিল্টি নয়। ঠাকুরটি যেমন বাহনটি চাই তেমন। হাঁড়ি বুঝে সরা না দিলে কি ঢাকনা বসে?

নাটোরের ঘটক গেল এক দেশ থেকে আর এক দেশে। নদী পেরিয়ে, খাল ডিঙ্গিয়ে, বন ছাড়িয়ে—পূবে, পশ্চিমে, উত্তরে দক্ষিণে। সারা বারেন্দ্রভূম জুড়ে চলল রাজা রামজীবন রায়ের ঘটক অভিযান।

একে একে সবাই ফিরে আসে। রামজীবন মাথা নাড়েন। শুধু একটি ঘটক এখনও ফেরেনি।

রামজীবনের কপালে ভ্রূকুটি, ক্রোধে নয় চিন্তায়।

বংশ মেলে তো পাত্রী মেলে না, পাত্রী মেলে তো বংশ মেলে না। শেষে কি—রামজীবন উঠে দাঁড়ালেন।—কি জানি নাটোরেশ্বরীর কি ইচ্ছা কে জানে!

অবশেষে ছাতিনার ঘটক ফিরে এলো। রামজীবনের কাছে সংবাদ গেল, শুভ সংবাদ।

মহারাজ সাক্ষাৎ লক্ষ্মী প্রতিমা। বিধাতাপুরুষ নাটোরের রাজপুরী আলো করবার জন্যই বুঝি তিলে তিলে গড়েছেন। ঘটক মাথা নেড়ে চোখ বুজে বলল,—আহা কি দেখলাম। মেয়ে তো নয় যেন ইন্দ্রাণী! ঐটুকু মেয়ের কি সহবৎ—কি বুদ্ধি! কথা তো নয় যেন বাঁশীর সুর। চোখে মুখে জড়িয়ে আছে তেজ-বিনয়-দয়ার ত্রিবেণী সঙ্গম। লজ্জা আছে জড়তা নাই। আহা! মহারাজ দেখলেও সাত বৎসরের পাপ ক্ষয় হয়।

বলতে বলতে ঘটক ঠাকুর উত্তেজিত হয়ে উঠল।

রাজযোটক মহারাজ, রাজযোটক। কুষ্ঠি মিলিয়ে দেখে নিন মহারাজ! রাজার ঘরে এবার রাজযোটক।

রামজীবন স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখেন। অভিজ্ঞ মানুষ, রাজ্য শাসন করেন, লোক চালান—লোকের জহুরি। বুঝলেন অভিনয় নয়—অভিভূত। ঘটক সত্যি অভিভূত।

বললেন, বংশ পরিচয়?

ঘটকের মুখে হাসি ফুটল। মনের খুশিতে টগবগিয়ে উঠল ঘটক।

সে দিকে নিশ্চিন্ত মহারাজ! আমি সব জেনে এসেছি। ছাতিনাগাঁয়ের আত্মারাম চৌধুরী, মহাশয় ব্যক্তি। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, মহারাজের পালটি ঘর। লোকের মুখে মুখে নাম। ঘরে মা লক্ষ্মী আঁচল পেতেছেন। শান্তি আর সোনার সংসার। দীন দুঃখীর আশ্রয়দাতা, অতিথি অভ্যাগতের ভরসা। চৌধুরী বাড়িতে দান ধ্যান লেগেই আছে।

রাজা রামজীবনের মনে জ্বলে আশার আলো।

কে যাবে? যাচাই করতে যাবে বিচক্ষণ লোক। যে সে গেলে হবে না। এতো আর নবাব সরকারে খাজনা পাঠান নয় যে ঢাল তরোয়াল ঝনঝনিয়ে গেলেই হবে। বুঝতে হবে, বিচার করতে হবে, চুলচেরা হিসাব করতে হবে। রাজ সংসারে রাজলক্ষ্মী আসবে, এতো সহজ কথা নয়!

কে যাবে?—আর কে!—দয়ারাম। নাটোর রাজবাড়ির শুভাকাঙ্খী দয়ারাম—দীঘাপাতিয়ার দয়ারাম—নাটোর রাজ-সরকারের দয়ারাম। রামজীবনের ডান হাত। বুদ্ধিতে বল, পরামর্শে বল, শাসনে বল, উৎসবে ব্যসনে বল,—দয়ারাম নাটোরের, নাটোর দয়ারামের। আগে নাটোর তারপর দীঘাপাতিয়া।

সেই দয়ারাম চলেছেন ছাতিনা গাঁয়ে ষোল কাহারের তাঞ্জাম চড়ে।

বেলা ডুবে গেছে।

দয়ারাম মুখ বাড়ালেন। একটানে চলে এসেছে ক্রোশের পর ক্রোশ ডিঙিয়ে। কাহারদের কালো কষ্টিপাথরে খোদাই করা গা-গুলো ঘামে চিক্ চিক্ করছে। হাঁটছে না, কাহারেরা পায়ে যেন পাখির পাখা বেঁধে চলেছে। আর সেই গতির তালে পাটে বসা নরম আলো ছিটকে ছিটকে পিছলে পড়ছে ঘামে ভেজা দেহ থেকে।

দয়ারাম বললেন, ওরে তোরা একটু বিশ্রাম নে। ঐ শিমুল গাছের নীচে তাঞ্জাম নামা।

কাহার সর্দার সেলাম করে বলল, হুজুর সামনে জঙ্গল। রাতের পহর গাঢ় হবার আগে পার না হলে বিপদ হতে পারে।

বিপদ!—দয়ারাম সোজা হয়ে উঠে বসলেন।

রাজা রামজীবনের সীমানায়, দয়ারামের শাসনে বিপদ! গর্জে উঠলেন দয়ারাম,—রাজার রাজসাহীতে পথিকের বিপদ!

প্রমাদ গণল কাহার সর্দার। দয়ারাম পেঁজা তূলোর মত নরম কিন্তু আঁট বাঁধলে লোহার শেকল।

বলল, হুজুর! ঠগ ঠ্যাঙ্গাড়ে না হোক বুনো জানোয়ার আছে।

দয়ারাম হো হো করে হেসে উঠলেন।

—পাইকের হাতে বল্লম নাই? কাহারদের হাতে লাঠি নাই? বরকন্দাজের সড়কি নাই? দয়ারাম বললেন, নামা তাঞ্জাম, বিশ্রাম নে। জলপানি খা—

এই দয়ারাম। খাটায়ও যেমন দেখেও তেমন। লোক তো আর পোকা নয় যে তুচ্ছ করবে। ছোট হোক বড় হোক, রাজা হোক মজুর হোক, পরিশ্রমে সবাই ক্লান্ত হয়। খিদেয় সকলের পেটেই আগুন জ্বলে। সময় মত দানাপানি না পেলে হাতীও ভেঙ্গে পড়ে।

বরকন্দাজেরা হাতের মশাল জ্বালিয়ে চার কোণে পুঁতে দিল। তারপর চার কোণে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কোঁচড় থেকে মুঠো ভরে তুলে নিল মুড়িমুড়কি। আঁজলা ভরে জল খেয়ে ঠাণ্ডা করে গরমে টগবগিয়ে ওঠা দেহটিকে।

—দুই—

বাতাসের আগে কথা ছোটে।

সাঁঝের ঘোর লেগেছে ছাতিনা গাঁয়ের আকাশে। তুলসী-তলায় প্রদীপ জ্বলছে ঘরে ঘরে। ঠাকুরবাড়ির কাঁসর ঘণ্টা বাজছে ঢঙ ঢঙ। রাহী পথিকেরা রাতের আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে।

যেতে যেতে ছাতিনা গাঁয়ের মোড়লকে ডেকে বলে যায়।

—মোড়ল হুঁসিয়ার! ছাতিনার পথে এগিয়ে আসছে ষোল কাহারের তাঞ্জাম। আগে বরকন্দাজ পিছনে পাইক। ইয়া ষণ্ডা ষণ্ডা। শিমূলতলার বাঁক পেরিয়ে গাঁয়ে ঢুকল বলে।

সে কথা শুনে মোড়ল হায়রে বাপ বলে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল।

কে বটে? ষোল কাহারের তাঞ্জামটি কার বটে? নবাবী না রাজসাহী, না কি লালমুখো ইংজির-মিংজির? কে জানে অদ্দেষ্টে কি আছে!

মোড়লের হাঁক শুনে ছুটে আসে গাঁয়ের জোয়ান মর্দের দল।

মোড়ল বলে, চল হে চল, মশাল নিয়ে আগু বাড়িয়ে চল। দেখি কে আসছেনটি বটে! আগু বাড়িয়ে যেয়ে খুশি করতে হবেন হুজুরদিগে। না হলে দেখবা জরু গরু সব ভাস্তে যাবে। মুণ্ডুটিও কাঁধের উপরে থাকবে নাই। হাঁ আর ক'জন গাঁয়ে ঘুরে বিটিছেল্যা আর বাচ্চাদের সাবোধান করে দাও গা, যে কদিন হুজুরটি এগাঁয়ে থাকবেক, সে কদিন যেন হুজুরের লোক লস্করের চোখের ছামুতে তারা না বার হয়।

দয়ারামের তাঞ্জাম আসছে।

শিমুলতলার বাঁক পেরিয়ে ডাঙ্গা জমির পথ ধরেছে। পাইকের হাতে জ্বলে মশাল। অন্ধকারের বুক ছেঁদা করে আলোর ফিনকি ছোটে। ছাতিনা গাঁয়ের দিক থেকেও মশালের আলো এগিয়ে আসে। দয়ারামের তাঞ্জাম দাঁড়িয়ে পড়ে। পাইক বরকন্দাজের ঢাল সড়কি ঝনঝনিয়ে ওঠে। ঘিরে দাঁড়ায় তাঞ্জাম।

সর্দারের বাজখাই গলা গাছের পাতা কাঁপিয়ে ঘুমন্ত পাখির কলরব জাগিয়ে ছুটে যায়।

– হু-শি-য়া-র—নাটোর রাজসাহীর তাঞ্জাম—সা-বো-ধা-ন—।

মোড়ল হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়ে আসে।

—হুজুর দণ্ডবৎ, ছিরিচরণে আনেক আনেক দণ্ডবৎ। আমরা আগু বাড়িয়ে নিতে এসেছি। আমি হচ্ছেন গাঁয়ের মোড়ল। হুজুরের শরীল গতিক ভাল তো?

পাইক বরকন্দাজেরা সড়কির মুখ নীচু করে।

দয়ারাম মুখ বাড়ালেন।

দেওয়ানজি! মোড়লের হাতের মশাল কেঁপে উঠল। দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। রাজা রামজীবনের ডান হাত। রাজা দেওয়ানজির কানে শোনেন, দেওয়ানজির চোখে দেখেন, দেওয়ানজির মুখে কথা বলেন।

—হুজুর আপনি! মোড়ল ভয়ে বিনয়ে দিশেহারা। কাঁপা গলায় আপশোষ জানায়। হুজুর আসছেন জানলে মিছিল করে হুজুরকে গাঁয়ে নিয়ে যেতাম।

দয়ারাম অভয় দেন।

তোমাকে দেখে আমি খুশি হয়েছি মোড়ল।

মোড়ল জোড় হাত কপালে ঠেকায়।

আমরা চাষাভূষো গেঁয়ো মনিষ্যি, হুজুরের মান্যিগন্যি আমরা কি জানি ?

দয়ারাম বললেন, আত্মারাম চৌধুরীর বাড়ির পথ দেখাও।

মিছিল এসে দাঁড়ায় চৌধুরী বাড়ির আঙ্গিনায়।

মোড়লের লোক আগেই এসে সংবাদটি দিয়েছে আত্মারামের কানে।

—বাবা ঠাকুর গো—আরে বাপ্! হাঁপাতে হাঁপাতে মোড়লের লোক দৌড়ে এসে ধপ করে বসে পড়ে।—এসে গেছেন গো বাবা ঠাকুর এসে গেছেন!

লোকটি বলে আর হাঁপায়, হাঁপায় আর বলে। আর কি দেখছেন বাবা ঠাকুর! এসে পড়ল বলে, সামাল দেন এবার।

আত্মারাম চৌধুরী ভয় পান।

এসে গেছে! সামাল দেন! কি এলো? কে এলো? বর্গী এলো কি? না দলছুট নবাবী ফৌজ এগিয়ে আসছে হানা দিতে?

ব্যস্তভাবে বললেন, কি এলো? কে এলো?

লাটোরের দেওয়ানজি গো বাবা ঠাকুর। লোকটি চোখ বড় করে বলে। আগে কখন দেখিনি, নামটা শোনা ছ্যেলো। ছড়া কাটে লোকটি।

দয়ারামের দয়া ভারি—ভারি দয়া করে
অবাধ্য হইলে দয়া নখে টিপে মারে।

ইয়া গোঁপ, ইয়া বুকের ছাতি। গলার আওয়াজ শুনলে পেরাণ পাখি চমকে ওঠেন।

আত্মারাম ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলেন। চিন্তিতও হলেন। দেওয়ানজি আসছেন, কি ব্যাপার! যাক্ যে জন্যই আসুন, অতিথি নারায়ণ। আত্মারাম ভিতরে খবর পাঠালেন।

বললেন, ভয়ের কি আছে। দেওয়ানজি হয়ত মহালে বেরিয়েছেন ভয় পাচ্ছিস কেন?

এঁ্যা! লোকটি অবাক হয়ে আত্মারামের মুখের দিকে তাকাল। বলে কি বাবাঠাকুর! ইঃ রে বাপ., কথায় বলে—

রাজার গুঁতো ভুতুম ভাতুম
দেওয়ান মারেন প্যালা
পাইকের হুড়কো পিটে পড়ে
যেন শাল কাঠের চ্যালা!

সেই দেওয়ান আসছেন, সঙ্গে আছে পাইক বরকন্দাজ। প্যালা আর চ্যালা কোনটাই বাদ যাবে না। গাঁ শুদ্ধু সবাইকে হয়ত হাতে দড়ি দিয়ে নাটোর নিয়ে যাবে।

নেমে দাঁড়ালেন দয়ারাম।

আত্মারাম অভ্যর্থনা জানালেন। কিন্তু মনে প্রশ্ন, বুকে শঙ্কা। নগণ্য গাঁয়ে, নগণ্য গৃহে রাজঅতিথি। ভয়ের চেয়ে ভাবনা বেশি। উপযুক্ত সম্মান খাতির চাই। রাজঅতিথি আর শনিঠাকুরে তফাৎ নাই। ক্ষণে তুষ্ট ক্ষণে রুষ্ট, তুষ্ট রুষ্ট ক্ষণে ক্ষণে!

আত্মারাম বললেন,—স্বাগতম্, অতিথি নারায়ণ, অতিথির পায়ের ধূলোয় গৃহস্থের কল্যাণ।

দায়ারাম হেসে বললেন,—চৌধুরী মশাই! এ নারায়ণ কিন্তু দামোদর— .

কথা শুনে আত্মারামের মুখে মৃদু হাসি, গাঁয়ের মোড়ল সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে খুশি। নাঃ, দেওয়ানজি মশাইয়ের কথা যা শোনা যায় ঠিক তা নয়। মাটির মানুষ, সরল মানুষ।

আত্মারাম বললেন,—ভক্তের খুদকুঁড়োয় দামোদর সন্তুষ্ট হন। দুর্যোধনের সোনার থালা ঠেলে দামোদর বিদুরের খুদের জন্য হাত বাড়িয়েছিলেন।

দয়ারাম হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠেন।

গাঁয়ের লোকেরা বিদায় নিয়েছে।

বরকন্দাজেরা আর পাইক কাহারেরা নাটমন্দিরে আশ্রয় পেয়েছে।

ধপধপে ফরাস পাতা চৌকিতে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে আছেন দয়ারাম। হাতে আছে আলবোলার নল। আত্মারাম বসে আছেন সামনে। বাইরে ছাতিনা গাঁয়ের আকাশে চাঁদ উঠেছে। পঞ্চমীর চাঁদ। গাঁয়ের নীরব বুকে মাঝে মাঝে দু'একটা রাতচরা পাখী শীষ দিচ্ছে। সাঁঝের আঁধার নামলেই গাঁয়ের পথঘাটে লোক চলে না।

দয়ারামের এই আকস্মিক আগমনের কারণ শুনে আত্মারাম বিষম চিন্তায় পড়েছেন।

রাজা-রাজড়ার ঘরে মেয়ে দিলে মেয়ে সুখী হবে কিনা কে জানে? শেষে মেয়েটা দুয়োরাণী না হয়। রাজা রাজড়ার মর্জি,—গোয়ালভরা গরুর মত অন্দরভরা রাণী। তাছাড়া আছে বাইরের টান। বাঈজী আছে, ইয়ার বক্সী আছে, নিত্যি নতুন সখ আছে।

আত্মারাম চিন্তায় পড়লেন।

গলায় যেন মাছের কাটা ফুটেছে। হ্যাঁ বলতেও মন চায় না, না বলতেও সাহস হয় না। জলে থেকে কি কুমীরের সঙ্গে বিবাদ চলে?

মাথা চুলকে বললেন আত্মারাম, তাইতো দেওয়ানজি! এতো সুখের কথা। তবে কিনা একবার ভিতরের অনুমতিটাও দরকার। মেয়ের মাকে একবার জিজ্ঞেস করি কি বলেন?

দয়ারাম গড়গড়ায় টান দিয়ে বললেন, সে তো বটেই। আমার হয়ে তাঁকে বলবেন, আপনাদের ঘরে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী বিরাজ করছেন। তাকে নিয়ে আমি নাটোর রাজবাড়িতে স্থাপন করতে চাই।

শুনে চৌধুরী গৃহিণী খুব খুশি।

স্বামীর গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে বিরক্ত হলেন। দেখনা কাণ্ড! সাতটা পাঁচটা না একটি মাত্র মেয়ে, তার সৌভাগ্যে কোথায় হাসবে না মুখ গোমড়া করে আছে। কি লোকরে বাবা!

বললেন, কি হলো, তুমি মুখ গোমড়া করে আছ কেন?

ভাবছি।

ভাবছি! বলে কি ভদ্রলোক? মুখ ঝামটা দিলেন চৌধুরী গৃহিণী। কি আবার ভাবছ? ভাববার এতে আছে কি? সোনার হরিণ সেধে নিজে এসেছে, খুব কষে বেঁধে ফেল গে যাও যেন পালিয়ে না যায়।

সাধে কি আর মেয়েমানুষ বলে! আত্মারাম বললেন, খুব তো মেয়ের সৌভাগ্যের কথা ভাবছ। ডাইনে দাসী বাঁয়ে বাঁদী, রূপোর খাটে সোনার ঝালর—মেয়ের সুখের সীমা নাই। তুমি হবে রাজার শাশুড়ী, গরদের জোড় আর মোহরের থান সাজিয়ে রূপোর পরাতে তোমার প্রণামী আসবে। সুখের সমুদ্রে বান ডাকবে।

থামতেই তো চৌধুরী গৃহিণী বললেন, কোন্ মা মেয়ের সুখ না চায়?

আর শান্তি?

শোন কথা! চৌধুরী গৃহিণী অবাক হয়ে স্বামীর দিকে তাকান। ভদ্রলোকের মাথার গোলমাল হয়নি তো? বললেন, সুখ হলেই শান্তি।

না। চৌধুরীর গম্ভীর গলা আরো গম্ভীর হলো। সুখ হলেই শান্তি হয় না, কিন্তু শান্তি হলে সুখ হয়। টাকায় সুখ কেনা যায়, শান্তি কেনা যায় না। সুখ থাকে বাইরে, শান্তি থাকে মনে! সুখ আর শান্তি এক সঙ্গে পাওয়া অমাবস্যায় পূর্ণিমার চাঁদ দেখার মত।

চৌধুরী গৃহিণী ঘাবড়ে গেলেন। ওরে বাবা! এসব আবার

কি কথা। মনটা কেমন দাবিয়ে দেয়। সামলে নিলেন আবার। যত সব অলক্ষুণে কথা। বললেন, দেখ তোমার ও সব শাস্তর কথা রেখে দাও। আমি বিয়ে ওখানেই দেব।

খুবতো জোর গলায় বলছ? আত্মারাম বললেন, দিদিমার কাছে সুয়োরাণী দুয়োরণীর গল্প শোন নি? ভগবান না করে, রাজার ছেলে বারটানে যদি গা ভাসিয়ে দেয় আটকাবে কে? তখন মেয়ে তোমার সোনার ছাপর খাটে শুয়ে চোখের জল ফেলবে। ন' মাসে ছ' মাসে একবার স্বামীর দেখা পাবে কি না পাবে। তখন?

চৌধূরী গৃহিণী একটু ভাবলেন। তাইত। এমন তো হতে পারে। তখন? আবার ভাবেন, ওসব কপালের লেখন। বিধাতা পুরুষ জন্মের সময় লিখে দেন। খণ্ডাবে কে? এমন যে রামচন্দ্র আর সীতাদেবী তাঁরাও পারেন নি। বললেন, দেখ এসব বাজে বকে আমার মন খারাপ করে দিয়ো না। আমি ওখানেই মেয়ের বিয়ে দেব। তারপর আমার মেয়ের অদ্দেষ্ট। বাপ মা তো ঘর বর দেখেই মেয়ে দেয়। তারপর অদ্দেষ্টে যা আছে তা হয়। আমি মেয়ে ওখানেই দেব।

চৌধুরী গৃহিণী দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করে স্থানান্তরে চলে গেলেন। আত্মারাম চৌধুরী নিজের কপাল ছুঁয়ে বলে উঠলেন, ভবিতব্য!

—তিন—

গাঁয়ের লোক ভেঙ্গে পড়েছে চৌধুরী বাড়ির আঙ্গিনায়। ছাতিনা গাঁয়ে হবে নাটোর রাজকুমারের বিয়ে! গাঁয়ের চৌধুরী বাড়ি হবে রাজকুমারের শ্বশুরবাড়ি। সহজ কথা নয়। চৌধুরী মশাই, যার সঙ্গে দু'বেলা সাক্ষাৎ হয়, আপদে বিপদে বুদ্ধি পরামর্শের জন্য গাঁয়ের মোড়ল যার কাছে ছুটে আসে, তিনি হবেন রাজকুমারের শ্বশুর। একদিন আবার রাজকুমারই হবেন রাজা। কথাটা বুঝে দেখ। নেহাৎ চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। ভিন গাঁয়ে যেয়ে মাথা উঁচু করে বেড়াবে গাঁয়ের লোকেরা। বেড়াবে না? মান বাড়ল যে! বিয়ের বাজারে গাঁয়ের ছেলে মেয়েদেরও দাম বেড়ে গেল। সাত গাঁয়ের সমাজেও দাম বাড়ল বইকি। কোন গাঁয়ের মেয়ে আনলে গো?—ছাতিনা গাঁয়ের। ছাতি ফুলিয়ে উত্তর দেবে। চিনলে না, যে গাঁয়ে নাটোরের শ্বশুরবাড়ি। মেয়ে নিতে চাও ছাতিনা গাঁয়ে? মুঠো ভরে ট্যাকা ছাড়ো, উচিত মত বিদায় দিতে হবে পাঁচজনকে। ছেলে হলো নাটোরের শ্বশুরবাড়ির গাঁয়ের। বুঝে শুনে এগিয়ো বাপু আমাদের একটা ইজ্জত আছে!

হাতজোড় করে দাঁড়াল সবাই দয়ারামের চারদিকে।— হুজুর আমাদের একটা পিত্যেশ আছে। পিত্যেশ মানে প্রত্যাশা। হুজুরদিগে আমরা জলুষ করে নিয়ে আসব। পাইক বরকন্দাজদের বলে, আরে ভাই তুমরা তো হলেন গিয়ে আমাদের নিজেদের

লোক হে। বল কি খাবা? খাসি ভাত? দুধ কলা? পিঠে পরমান্ন? বল ভাই বল। যত্ন আত্তি করে গাঁয়ের কথাটা বুঝিয়ে দেই।

গাঁয়ের লোকের উৎসাহের সীমা নাই। সবাই বলে চৌধুরী মশাই ভোজ দিন। সারা গাঁয়ের লোক খাবে। আমাদের মা ভবানী হবেন রাজরাণী আমরা একটা ভোজ পাব না?

গাঁয়ের পুরোহিত ঠাকুর এলেন পাঁজি হাতে। দয়ারাম আশীর্বাদটি সেরে যাবেন। সময় দেখতে হবে। পুরোহিত ঠাকুর টিকি নেড়ে শ্লোক আওড়ে বললেন, হুজুর! রাজবাড়ির কাজ মানে যাকে বলে রাজকার্য্য।—সিক্কা টাকায় দক্ষিণা নেবো না। একটি পুরো আর্কটি মুদ্রা চাই, রাজবাড়ির মর্যাদা।

বিয়ের দিন যত ঘনিয়ে আসে আত্মারামের চিন্তা তত বাড়ে। রাজবাড়ির সঙ্গে কুটুম্বিতা। তাদের আলাদা মর্যাদা। লোক আসবে তাঞ্জাম চড়ে, ঘোড়া ছুটিয়ে, পায়ে হেঁটে। তাও দুচারটি নয়, একগাদা। তার উপরে আছে গাঁয়ের লোকজন, আছে আত্মীয় কুটুম্ব, জ্ঞাতি বন্ধুর দল।

আত্মারাম ভেবে কুল পান না: কি হবে! কোথায় এত অর্থ?

গাঁয়ের মোড়ল বলে, ভয়টা কি চৌধুরী মশাই? আমরা আছি।

তোমরা আছ!—আত্মারাম বলেন, কিন্তু আমার তো সাধ্য নাই।

মোড়ল হৈ হৈ করে ওঠে।

এই দেখ! আরে আমরা থাকতে গাঁয়ের মাথা হেঁট হবে? কিচ্ছু চিন্তা করবেন না, মুকসুদাবাদ থেকে নবাব সাহেব আসুক

না কেনে, সুতোনুটির ইনজিরি লোক আসুক না কেনে, আমরা আছি। যত্ন আত্তির অভাব হবেনি।

জেলে পাড়ার লোকেরা এসে বলে গেল, আমরা আছি চৌধুরী মশাই, দেখে লিব লাটারের লোক কত মাছ খেতে পারে। জান যাবে তো গাঁয়ের মাথা হেঁট হতে দেবনি। যত মাছ লাগে আমরা যোগান দেব। গোয়ালারা ভরসা দিল, আমরা আছি ঠাকুর বাবা। দুধ দই ক্ষীরে নদী বইয়ে দেব। ছাতিনার রসকদম খেয়ে নাটোরের কাঁচাগোল্লার কথা লোকে ভুলে যাবে। চাষীরা বলে গেল, চালের ভার আমরা নিলাম। বাসমতি চাল সরু সরু হাল্কা দানা। এক গাঁয়ে রাঁধলে সাত গাঁয়ে বাস ছড়িয়ে পড়বে। কম পড়লে ঘরের চাল বার করে দেব। গাঁয়ের মহাজন লোক পাঠালেন। যা চৌধুরী মামাকে বলে আয়, ভবানী দিদির বিয়ের খরচ আমার। চৌধুরী মামা একা সামলাতে পারবেন না। রাজ অতিথিদের তরে রাজার মতই ব্যবস্থা হবে। শুনে আত্মারাম ছুটে গেলেন মহাজনের কাছে। গ্রাম সুবাদে ভাগ্নে বলে ডাকেন। বলেন ভাগ্নে তুমি কি আমাকে ঋণী করে রাখবে?

সেকি কথা মামা। মহাজন বলে, আমার বোনের বিয়ে হচ্ছে রাজবাড়িতে এসময় যদি আমি চুপ করে বসে থাকি, আর লগ্নির হিসাব করি ধর্মে সইবে? মহারাজ তো আপনার কুটুম নয়, গাঁয়ের কুটুম। এ আমাদের সকলের কাজ। যান আপনি খেয়ে চুপ করে বসে থাকুন। বলি আমাদের গাঁয়ে অভাবটা কি?

না বাবা তা নাই। কিন্তু—

মহাজন হাত তুলে বলে ওঠে, আর কিন্তু নাই মামা। যান আপনি জোগাড় যন্তরে লেগে যান। শুধু মুখের কথাটি খসাবেন, দেখবেন ভূতে সব মাল যোগাবে। বলে দিলাম দেখে নেবেন, মহারাজকেও বলে যেতে হবে হাঁ, ছাতিনার লোকেরা রাজারাজড়ার সঙ্গে কাজ করতে জানে বটে। যান মামা বাড়ি যান, মামীকে যেয়ে

মালা, সাতলহরী সোনার হার, জড়োয়া বাজু, ঝুমকো, পদ্মচূড়, মাজার চন্দ্রহার, পায়ের পায়জোড়, হীরের নথ, কাশীর সিঁদুর কৌটো, এলাহাবাদের ডাবর—কি নাই? আরো কত আছে, কে জানে বাবা তার কি নাম আর সে সব দিয়ে কি করতে হয়। খাবারই বা কত রকম, দেখা তো দূরের কথা নামও কেউ শোনেনি।

রাজবাড়ির দাসদাসী লোকজন চৌধুরী বাড়ির আঙ্গিনায় গিজগিজ করছে। তারা আবদার ধরেছে নতুন মাকে দেখব।

দেখবে বই কি! চৌধুরী গৃহিণী বলেন, বসো, আগে জল-পানি খাও।

—বাইরে আছে দেবীপ্রসাদ আর গোমস্তা। সেখানে আছেন আত্মারাম।

বিদায়ী দিতে হবে। দু'একজন নয়, দেড়শ,—মানে ধর সাতকুড়ি হয়েও আরো দশজন।

গাঁয়ের মোড়ল ভীড় ঠেলে এসে সামনে দাঁড়াল, কি গো মামী এত জোর তলব কেন? তারপর অধিবাস সামগ্রার দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল।—আরে বাঃ! রাজারাজড়ার ব্যাপার—কাণ্ডই আলাদা! দেখ, দেখ,—এ গাঁয়ের জন্ম সার্থক হলো।

চৌধুরী গৃহিণী মাথায় আঁচল দিয়ে এগিয়ে এলেন। চোখ পর্যন্ত টেনেছেন ঘোমটা।

বিদায়ী দিতে হবে—

হ্যাঁ, হ্যাঁ তাতো দিতেই হবে। মহাজন বললেন, যে কাজের যে রীত—

—কিন্তু—

কিন্তু আবার কি। মহাজন হাত নেড়ে বললেন, চৌধুরী মামার সঙ্গে তো কথাই হয়ে আছে। যখন দরকার হবে আমাকে শুধু খবরটি পাঠিয়ে দেবেন। আমাদের মামা ভাগ্নের এ ব্যবস্থা হয়ে আছে।

—জানি। চৌধুরী গৃহিণী মৃদুস্বরে বললেন, তিনই তো খবর দিতে বললেন।

বলবেনই তো, ব্যবস্থা হয়ে আছে যে! থাকগে—মহাজন ব্যস্ত-ভাবে বললেন, কজনা? দেড়শ?—ঠিক আছে—ব্যবস্থা করছি। বলে, এগিয়ে যেতে যেতে ফিরে দাঁড়াল। বুঝলেন মামী, ভাঙ্গা নয়, ঐ পুরো একটি করে দেবেন। তাঁরা রাজারাজড়া, বলি আমরাও তো ভিখারি নই! গাঁয়ের একটা মান আছে তো? মহাজন হন হন করে চলে গেল।

—চার—

নাটোরের রাজপ্রাসাদ জমজমাট। রামজীবনের সুখের পালে ভরা বাতাস। ঘরে বাইরে সুখ শান্তি। নবাব খাতির করেন। সুতো-নুটির ইংরাজরাও ভেট উপঢৌকন নিয়ে আসে। ছেলে রামকান্ত অনুগত। রাজা রামজীবনের বড় সুখ।

সুখের যখন ষোলকলা পূর্ণ তখন ডাক এলো ওপার থেকে। কিইবা এমন বয়স হয়েছিল! কিন্তু জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে এতো আর কারও হাত ধরা নয়। যখন যার যে রকম নিয়তি সে সুখেই থাক আর দুঃখেই থাক, ছোটই হোক আর বড়ই হোক, নিয়তি সময় বুঝে টানবেই।

রাজা রামজীবনেরও টান এসেছে।

দয়ারামকে ডেকে হাতে তুলে দিলেন রামকান্তকে।—দয়ারাম সব রইল আর তুমি রইলে। তুমি ছাড়া নাটোর নয়, নাটোর ছাড়া তুমি নয়। তবুও তোমাকে বলে যাই তুমি দেখো। কান্ত ছেলে মানুষ, তুমি আছ তাই আমি নিশ্চিন্ত।

রামজীবন নিশ্চিন্ত হয়ে গেলেন। কিন্তু দুশ্চিন্তা বাড়ল দয়ারামের।

খাঁচার বদ্ধ দরজাটি খোলা পেয়ে পাখি ডানার ঝাপট মারতে আরম্ভ করেছে।

দয়ারামের কানে আসে নানা কথা। দেখেনও কিছু শোনেনও কিছু। চালাক মানুষ বাকীটা অনুমান করে নেন।

নাটোরের রাজা এখন রামকান্ত—সবে মাত্র কুড়িটি বসন্ত পার হয়েছে। রামকান্তের এখন সখের প্রাণ গড়ের মাঠ। ইয়ার বক্সী জুটেছে, বাঈজী এসেছে, নিত্য নতুন উৎসব উৎসাহ। রামকান্তর এখন সুখের নেশা।

দয়ারাম দেখেন, ভবানী শোনেন। উড়ো খবর আসে। রাজপুরীতে গুজব উড়ে বেড়ায় পাখা মেলে।

রামকান্ত বাইরের টানে ঘর ভোলে। ছাতিনা গাঁয়ে আত্মারামের কানেও যায় সে কথা। আত্মারাম বলে উঠেন—ভবিতব্য।

দয়ারাম ভাবেন, তাইতো কি করি। ভবানীকে বলে—মা জননী, বাঁধতে চেষ্টা কর। ষোল বছরের ভবানীর গায়ে বসন্তের হাওয়া লেগেছে।—ফুটে ওঠা আমের মঞ্জরীর মত। তবুও শূন্য ঘরে শূন্য মনে দিন কাটে ভবানীর। ঘরের মৌমাছিটির মনে লেগেছে মহুয়ার ঘোর। আমের মঞ্জরী ছেড়ে ঘুরে বেড়ায় মহুয়া ফুলে রসাল যতই রসাল হোক, মহুয়ার মাদকতা কই?

দয়ারামের কথায় ডাগর চোখে বানের জল উথলে উঠতে চায় সামলে নেয় ভবানী। নীরবে কথা শুনে নীরব থাকে। দয়ারাম দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেন।

ইয়ার বক্সী নিয়ে রামকান্ত চলেছেন। দয়ারাম দাঁড়ালেন পথ আটকে।

জরুরি কাজে এখনই একবার দপ্তরে যেতে হবে

রাশভারি দয়ারামকে রামকান্ত সমীহ করে। ইয়ার বক্সীরা ভয় করে। দয়ারাম রামকান্তকে এনে দপ্তরে বসালেন। ঠিক যেখানটিতে রামজীবন বসতেন সেখানে। এমনি করে চোখের আগলে, কাজের পাকে জড়িয়ে বাঁধতে চাইলেন রামকান্তকে।

জেদী রামকান্ত মনে মনে গুমরে উঠল। একটু একটু করে মনে জমতে থাকে চাপা আক্রোশের বোঝা। ইয়ার বক্সীরা সুযোগ বুঝে ইন্ধন জোগায়। দয়ারাম বোঝেন সব।

বলেন, বাবা রাজকার্যও করবে আমোদ আহ্লাদও করবে। সব জিনিস বাজা তবেই রাজা। মানে তুমি সব করবে। যা সবাই পারে তাও করবে যা সবাই পারে না তাও করা চাই। সব বাজা মানে সব কিছুই বাজিয়ে দেখে নেবে।

রামকান্ত ফেটে পড়ে। মেঘে মেঘে জমে ওঠা বিদ্যুৎ তরঙ্গ যেমন হঠাৎ ঝলকানি দিয়ে ওঠে তেমনি রামকান্তের মেঘলা মনে ঝলকানি জাগে।

—কাজ যদি আমাকেই করতে হয়, তবে আপনারা আছেন কেন?

চমকে উঠলেন দয়ারাম।—কি বললে?

শুনেও বিশ্বাস হয় না দয়ারামের। ভাবেন হয়ত ভুল শুনেছেন। রামজীবনও কোনদিন এত বড় কথা বলেন নি।

রামকান্তের রক্তে নেশা ধরেছে। ক্ষমতার মোহ আর অর্থের বিষে আগুন জ্বলে মাথায়। বাঁধ যখন ভেঙ্গেছে তখন আর বাধা কি? মনে পড়ে ইয়ার-বক্সীদের কথা,—সাবধান মহারাজ, নাটোর ভাঙ্গছে, দীঘাপাতিয়া গড়ছে—আপনার রাজগি যেয়ে ঢুকবে দীঘাপাতিয়া জমিদার বাড়িতে।

মনে রাখবেন—রামকান্ত বলল, নাটোরের খেয়ে দীঘাপাতিয়া মানুষ। কিন্তু আর বাড়তে দেব না। আপনি ইচ্ছা করলে, সেরেস্তায় হিসাব বুঝিয়ে দিয়ে চলে যেতে পারেন।

তাই যাব। দয়ারাম বললেন, শোন রামকান্ত যাবার আগে বলে যাই, রাজ্য রাখতে চেষ্টা করো। যদি তোমার রাজাগিরি না ঘুচাতে পারি তবে অমার নাম দয়ারাম নয়।

পুরানো কর্মচারীরা মাথা নীচু করে বসেছিল। রামকান্তের কি মতিচ্ছন্ন হলো? রাজজীবন যাকে সম্মান করতেন, শ্রদ্ধা করতেন তাঁকে অপমান!

কর্মচারীরা জোট বাঁধে।—আমরা কাজে ইস্তফা দেব। দেওয়ানজিকেই যদি অপমান করতে পারে তবে আমরা আর কি! কোনদিন কি খেয়াল হবে আর কাঁধের মুণ্ডুটি খপ করে উড়িয়ে দেবে। অসতী মেয়ে মানুষ আর অত্যাচারী রাজা সমান। দুজনের কাছেই প্রাণ সংশয়। অসতী নিয়ে ঘর করতে নাই, অত্যাচারীর কাছে থাকতে নাই।

দয়ারাম বুঝিয়ে নিরস্ত করেন।

—তা হয় না। আপনারা গেলে নাটোর ভেসে যাবে।

যাবে কি দেওয়ানজি! বৃদ্ধ সেরেস্তাদার বলে ওঠে—আপনাকে অপমান করার সঙ্গে সঙ্গেই ভাসতে আরম্ভ করে দিয়েছে।

দয়ারাম মনের কথা মনেই রাখেন। বললেন, না আপনারা যাবেন না।—গম্ভীর কণ্ঠ, দৃঢ়স্বর। সেরেস্তার কর্মচারীরা এ গলা চেনে।

কর্মচারীরা সেরেস্তায় ফিরে যায়।

রাজপুরী থম থম, দয়ারাম চলে যাবেন। ভবানীর চোখের জল বাধ মানে না।

—কাকাবাবু!

—কি মা? আলবোলার নল রেখে দয়ারাম তাকালেন।

—বাবা নাই, আপনিও চলে যাবেন? ভয়ে, অভিমানে ভবানীর কান্না ভেজা গলা বন্ধ হয়ে যায়।

মা! দয়ারাম গলা নামিয়ে বললেন, মহারাজ আর তোমার

মুখ চেয়েই আমি রামকান্তকে ক্ষমা করেছি। নাহলে দয়ারাম কখন অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করে না। কিন্তু রামকান্তের একটু শিক্ষার দরকার শিক্ষা দিতে হবে। চিন্তা করো না, আমি আছি।

তৈরী হলো প্রকাণ্ড মজলিস গৃহ। সারঙ্গি আর বাঈজীর নুপুর বাজে। . মজলিস, মাইফেল, মুজরার উৎসব চলে রাতদিন। রাজ্য পাটে মন নাই রামকান্তর, প্রজার কান্না কানে যায় না, নবাবের খাজনা বাকী পড়ে। রামকান্তের চৈতন্য নাই। বিশ্বস্ত কর্মচারীদের দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ে। ভাবে রাজাতো রাজ্য দেখে না, রাজ্যপাটে মন নাই, রাণীর দরবারে দেখা যাক।

ষোল বছরের রাণী, ষোল বছরের বুদ্ধি নিয়ে কুল পায় না। তবুও চেষ্টা করে। অভিযোগ করে। রামকান্ত নির্বিকার। —বলে, তুমি দেখ।

আমি কি জানি। ভবানী বলে, তুমি রাজা, তুমি যা পার আমি সে কাজ কি করে করব?

—আমি ঘরের বউ।

না তুমি রাজার রাণী। রামকান্ত ভবানীকে আদর করে বাইরের দিকে পা বাড়ায়।

ভবানী চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখে।

কর্মচারীরা এসে দাঁড়ায়,—মা সব যে গেল!

বুকচেরা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে ভবানী।

দীঘাপাতিয়ায় বসে সব খবর পান দয়ারাম। মাঝে মাঝে আলবোলার নল হাতে যখন ঝিমানি আসে, হঠাৎ চমকে ওঠেন। দু'হাতে চোখ মুছে তাকিয়ে দেখেন।—নাঃ। কেউ নাই, স্বপ্ন। কিন্তু স্বপ্ন হলেও মিথ্যা নয়। ভবানীর কাছে গিয়ে দাঁড়ালে

ঠিক স্বপ্নের মতই অভিমান ভরে অনুযোগ করে বলবে, কাকা এমনি করেই কি আমাদের ঠেলে দিতে হয়?

দয়ারাম উঠে দাঁড়ালেন। নাঃ এবার শেষ দৃশ্যের পরে যবনিকা ফেলতে হবে।

ওরে নায়েব মশাইকে খবর দে, আমি মুকসুদাবাদ যাব। বজরা সাজাতে বল।

দয়ারামের বজরা ভাসে নদীর জলে। সঙ্গে আছে দেবীপ্রসাদ। শেষ দৃশ্যের অভিনয় সুরু হবে। নাটোর থেকে গোপনে আনিয়ে সঙ্গে নিয়ে চলেছেন। কেউ জানে না কেন। দেবীপ্রসাদ নিজেও না।

বর্গীর হাঙ্গাম শেষ হয়েছে। শেষ বোঝাপড়া হয়ে গেছে নবাবের সঙ্গে। নবাবের কোষাগার শূন্য। রাজা জমিদারের বিপদ বাড়ল। হয় নবাবের খাজনা কড়ায় গণ্ডায় শোধ কর, না হয় গদী ছাড়। রাজস্ব চাই, বাকী বকেয়া শোধ কর। টাকা না হলে কোন কথা গ্রাহ্য হবে না। নবাবী কোষাগারে টাকা চাই।

নাটোরের খাজনা বাকী পড়েছে। রামজীবনের আমল নাই। ঘড়ির কাঁটার মত সময় রাখতেন রামজীবন। নবাবের খাজনা আগে পরে অন্য কথা। কিন্তু এখন সে আমল নাই। রাজা রামকান্ত নবাবী খাজনা পাঠায় না। টাকা যায় বাঈজী আর মাইফেল মুজরায়। রাজস্ব বাকী পড়ে।

নবাব শুনে ভ্রুকুঞ্চিত করেন। নাটোরের খাজনা বাকী! বুঝি বিশ্বাস হয় না কথাটা।—যেখানে দেওয়ান দয়ারাম আছে।

বললেন, ভাল করে দেখ।

দয়ারাম এসে কুর্নিস করে সামনে দাঁড়ালেন। আরে দেওয়ানজি!

আসুন, আসুন বড়ি—খুশি কি বাৎ! নবাব খুশি হয়ে অভ্যর্থনা করলেন। তারপর তবিয়ৎ কেমন, মেজাজ শরিফ তো?

—হুজুরের দোয়ায়—মানে আশীর্বাদে, ইসলামের আল্লা আর হিন্দুর ভগবানের কৃপায় গোলাম কুশলেই আছে। এখন হুজুরের তবিয়তের হাল হুকুমৎ জানালে বান্দা খুশি হয়।

নবাব হেসে বললেন, বয়সতো কম হলো না দেওয়ানজি। আপনার চেয়ে বড়ই হব।

কিন্তু—নবাবের স্বর গম্ভীর হলো। একি শুনছি দেওয়ানজি?

—ফরমায়েস করুন হুজুর।

—নাটোরের নাকি খাজনা বাকী পড়েছে?

দয়ারাম কুর্নিশ করে বললেন—হুজুর ভুল শোনেন নি। রাজা রামজীবন নাই। রামকান্ত শুধু ফুর্তি করে বেড়ায়।

নবাবের মুখ গম্ভীর হলো।

দয়ারাম বললেন,—হুজুর, প্রজাদের বড় দুর্দশা। আমি হুজুরের দরবারে আর্জি পেশ করতে এসেছি।

—হু! নবাব বললেন, রাজার আর ছেলে আছে?

না হুজুর। দয়ারাম বললেন—ভাইয়ের ছেলে আছে। হুজুরের মর্জি হলে হাজির করতে পারি।

নবাবের ফরমান বার হলো।

নবাবী ফৌজ দেবীপ্রসাদকে নিয়ে রওনা হলো নাটোরের পথে।

সংবাদ এলো নাটোরে। নবাবী ফৌজ ছুটে আসছে। তারা রাজবাড়ি লুট করবে।

নাটোর লুট করবে। সঙ্গে আছে দেবীপ্রসাদ। নবাবী ফৌজ দেবীপ্রসাদকে বসাবে গদীতে। রামকান্তকে জিঞ্জির পরিয়ে টেনে নিয়ে যাবে মুর্শিদাবাদ। আর রাণীকে নিয়ে তুলবে হারেমে।

রামকান্তের চৈতন্য হলো। মনে পড়ল দয়ারামের কথা। ইয়ার-বক্সীরা ভোজবাজির মত অদৃশ্য। কার কাছে যাবে, কে দেবে একটু বুদ্ধি পরামর্শ। কে বলবে তার হয়ে দুটো কথা।

রাজপুরী শূন্য, গোমস্তা কর্মচারী পালিয়েছে। নাটোর ফাঁকা। যে যেদিকে পেরেছে সরে পড়েছে। নবাবী ফৌজ আসছে। তাদের বিশ্বাস নাই। টাকা, পয়সা, জরু, গরু যা নজরে পড়বে কিছু বাদ দেবে না। যা নজরে পড়বে হাত বাড়াবে। হিন্দু মুসলমান ভেদ করে না। মর্জি হলে সেই সঙ্গে তরোয়ালের দু'এক ঘা বসিয়ে দিতেও কসুর করে না। কাজ কি বাবা এ ডামাডোলে থেকে। তার চেয়ে এখান থেকে সরে পড়া যাক, সব ঠিক হয়ে গেলে আবার গুটি গুটি ফিরে এলেই হবে। বানের জল তো আর চিরকাল থাকে না। আসেও যেমন, যায়ও তেমন।

রামকান্ত শূন্য চোখে তাকিয়ে দেখে চারদিকে।

আজ কেউ নাই, আছে শুধু ভবানী। তেমনি করে স্নেহমমতা মাখা হাত দুটি বাড়িয়ে, যেন অন্ধকারে দীপশিখা।

রামকান্তের চোখে জল এলো।

ভবানীর কি হবে ?

ভবানী নীরবে স্বামীর হাতটি শক্ত করে ধরে বলে ওঠে, আমার সঙ্গে এসো।

তোমার সঙ্গে ?

হ্যাঁ! ভবানী স্বামীকে নিয়ে খিড়কির দিকে এগিয়ে গেল— এসো।

সবার অলক্ষ্যে রাজপুরী ত্যাগ করে স্বামীর হাত ধরে ভবানী এসে বাইরে দাঁড়ায়। কোন অনুযোগ অভিযোগ নাই, ধীর স্থির।

পশ্চিম আকাশে সূর্য তখন পাটে বসছে।

রাজপুরীর পিছনে ঘন বাবলা বনের মাথায় লাল আলো জ্বলছে। নাটোরের রাজলক্ষ্মীর কপালেও সিঁদুর জ্বলে।

ধীরে ধীরে বাবলা বনের আড়ালে নাটোরের রাজ্যহারা রাজা-রাণী আত্মগোপন করল।

নবাবী ফৌজ তখন এসে রাজপুরীর সিংহদরজার বদ্ধ আগলে আঘাত করছে।

—পাঁচ—

বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার নবাবের ষোল বছর রাজ্য চালিয়ে আর বর্গীদের পিছনে ছুটোছুটি করে পিঠ বেঁকে গেছে। মাথার চুল পেকে শণের মত সাদা। শোথরোগ শরীরে কায়েমি আসন গেড়েছে। দেহে বা মনে শান্তি নাই। রোগের জ্বালা নষ্ট করেছে দেহের শান্তি। মনে শান্তি শেষ করেছে আদরের নাতি সিরাজ—ভবিষ্যত নবাব। নবাব মনসুরোল - মোলক - সিরাজউদৌল্লা - শাহকুলিখাঁ-মীরজা-মোহম্মদ-হায়দরজঙ্গ বাহাদুর। বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। বয়স আর কত হবে। দশের কোঠার শেষ সীমায়। কৈশোর শেষ হতে চলেছে। দুধে আলতা রং, মনোরম লাবণ্য, সবেমাত্র গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে, চেয়ে দেখবার মত। এর মধ্যেই ভবিষ্যত নবাব নারীদেহ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছেন। রাত কাটায় বাঈজীর ঘরে। তার চর ঘুরে বেড়ায় লোকের অন্দরমহল তাক করে। সুন্দরী মেয়ে আর বউদের অভিভাবকেরা শঙ্কিত হয়ে দিন কাটায়। কখন কোন ঘরে সিরাজের থাবা এসে পড়ে ঠিক কি। খুবসুরৎ জেনানা আর ফিরিঙ্গি সরাব নিয়ে উচ্ছৃঙ্খলতার বেহেস্তে বাস করেন ভবিষ্যত নবাব।

দাদামশাইকে যে খুব মান্য গণ্য করে এমন নয়। নবাব আদরের

নাতির জন্য ভাগিরথীর পশ্চিম তীরে গড়ে দিলেন হীরাঝিল। অন্য তীরে মাথা নীচু হলো মতিঝিলের। হীরাঝিলের আর এক নাম মনসুর-গদি। মনসুরগদি ঘিরে গড়ে উঠল মনসুরগঞ্জ। কিন্তু ভবি ভুলবার নয়। দাদুর উপরে সন্দেহ। এত ভালবাসা, এত স্নেহ, এত ক্ষমার পিছনে সিরাজ দাদুর অভিসন্ধির বিশ্লেষণ করে। ব্যাপার কি? দাদুর আসল উদ্দেশ্যটা কি? অনেক ভেবে সিরাজ বুঝল, আর কিছু নয় আদর দিয়ে ভুলিয়ে উত্তরাধিকার বঞ্চিত করবার ফিকির। যত ভাবে তত মরিয়া হয়ে ওঠে সিরাজ। যাকেই মনে হয় দাদুর প্রিয় তাকেই নিশ্চিহ্ন করে। হোসেন কুলিখাঁও একদিন এই সন্দেহের বলি হলেন। সিরাজ ঠিক করল বলং বলং বাহু বলং। এর চেয়ে বড় আর কিছু নাই। ব্যাস যে কথা সে কাজ। ঠিক হলো পূর্ণিয়া দখল করতে হবে। জানকীরামকে সেখানে না রেখে, অনেক আগেই পূর্ণিয়ার গদি তাকে দেওয়া নবাবের উচিত ছিল। যোগাড় হলো সৈন্য, গড়া হলো পল্টন। সিরাজ চলল পূর্ণিয়া দখল করতে। দাদুকে লিখল—

শিশুর মত আমাকে আর ভুলিয়ে রাখা চলবে না। আপনার বানান আদর আর মিষ্টি কথায় আমি আর ভুলছি না। অনেককেই আপনি রাজ্য পাট দিয়েছেন। আমার বেলায় ব্যতিক্রম কেন? এবার হয় আপনার শির আমার ঘরে না হয় আমার মাথা আপনার পায়ে ঠাঁই পাবে। আমি বাহুবলে নিজের দাবি আদায় করব।

একে সিরাজ চলেছে পূর্ণিয়ায় হাঙ্গাম করতে তার উপরে এমনি একখানা মোলায়েম চিঠি। বৃদ্ধ নবাবের ঠাণ্ডা রক্তও গরম হয়ে উঠল। বেয়াকিল। বেয়াকুফ কাহিকা।

নবাব কাগজ কলম টেনে নিলেন।—

'গাজিকে পায়ে সাহাদাৎ আন্দার তাগো পোস্ত।
গাফেলকে শাহীদে এসক্ ফাজেল্ তার আজ্ দোস্ত।

ফারদায় কেয়ামাৎ ইঁ বা আঁ। কায়মানাদ্,
ই কোস্তা তুষমানাস্ত ওঁ কোস্তায়ে দোস্ত।'

মানে ধর্মের জন্য যুদ্ধ করে যারা প্রাণ দেয়, তারা জানে না যে সংসারের রণক্ষেত্রে স্নেহের সঙ্গে যুদ্ধ করা কত গুরুতর। এই যুদ্ধে যে জয়ী হয়, সেই সব চেয়ে বড় বীর। নির্বোধ! তুমি ভুল করছ, না হলে তুমি অনায়াসেই বুঝতে পারতে যে আমার ক্ষমতার ভিতরে থাকলে, শুধু বিহার কেন সারা হিন্দুস্থানের আধিপত্য তোমায় দিতাম। তুমি জানো না যে শেষ বিচারের দিনে ঐ দুই বীরের একজনকে শত্রুর হাতে আর একজনকে প্রাণাধিক বন্ধুর হাতে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়।

পূর্ণিয়া জয় করতে গিয়ে সিরাজ জানকীরামের হাতে বন্দী হলো। নবাব ছুটলেন পূর্ণিয়ায় রুগ্ন দেহ নিয়ে। এদিকে জানকীরামের ধাক্কা খেয়ে সিরাজেরও কাঁধ থেকে ভূত নেমে গেছে। দাদুর সঙ্গে মুর্শিদাবাদ ফিরে এলো।

নবাবের রাজ্য জুড়ে চলছে এমনি ঘুর্ণিপাক। আর ওদিকে যতই দিন যাচ্ছে লালমুখো ইংরাজেরা ততই জমে বসছে সুতোনুটিতে। সুতোনুটি, গড় গোবিন্দপুর আর কালিঘাটের নাম হয়েছে —কলিকাতা-কলকেতা-কলকাতা-ক্যালকাটা-কালকূটা।

দেশে জোয়ার এসেছে—চল চল কলকেতা চল। দেখবে কেমন নতুন দেশ। আইন শাসন আছে। তোমার জরু গরুর দিকে কেউ চোখ তুলে নজর দিতে সাহস পাবে না। বেগার খাটাবে না। পাইক বরকন্দাজের হামলা নাই। বিচার আছে। ছোট বড় সবাই থাক। দিব্যি নিশ্চিন্তে দিন কেটে যাবে এমনি দেশ। উচ্ছন্ন যাক নবাব বাদশার রাজত্ব। বর্গীরা মরুক। লালমুখো গোরারা বাঁচুক। চল সবাই কলকেতা।

চারদিক থেকে বর্ষার ভরা গাঙের মত জোয়ার আসে কলকাতায়।

ভবানী আর রামকান্ত চলেছে মুর্শিদাবাদের পথে। দেখে লোকের স্রোত চলেছে সুতোনুটির দিকে। বলে—যাচ্ছেন কোথায়, মুকসুদাবাদ? তার চেয়ে চলুন সুতোনুটি। নিশ্চিন্ত আরামে পায়ের উপর পা রেখে দিন কাটাতে পারবেন। কেউবা বলে, সঙ্গে দেখছি মা-লক্ষ্মী আছেন। কাঁচা বয়েস, ও কাজটিও করবেন না মশাই। সেরাজ আছে সেখানে।

রামকান্ত ভাবে।

ভবানী সাহস দেয়।

না মুকসুদাবাদ চল। পৈতৃক রাজ্য উদ্ধার করতে হবে।

রামকান্ত স্থির দৃষ্টিতে তাকায়। ভবানীর সারা দেহে দৃষ্টি ঘুরে বেড়ায়। ভবানী রাঙ্গামুখ নীচু করে। গায়ে আঁচল টেনে দেয়।

রামকান্ত দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলে ভবানী ভাবছি একটি রাজ্য উদ্ধার করতে গিয়ে আর একটি রাজ্য না বিসর্জন দেই। সিরাজ পাষণ্ড। শুনেছি তার চর চারদিকে ঘুরে বেড়ায়।

ভবানী পূর্ণদৃষ্টি তুলে তাকায়।

রামকান্ত সে দৃষ্টি দেখে মুগ্ধ হয়, সাহস পায়। ভবানীর চোখে রাজেন্দ্রাণীর দৃষ্টি। ভবানী বলে, আমি নাটোরের রাজবধূ আমার খাপে ছোরা নাই? হাতে হীরের আংটিতে বিষ নাই? তুমি চল।

দয়ারাম আছেন মুর্শিদাবাদে। ছক পেতে ঘুঁটি চেলেছেন। পাকা খেলোয়াড়। চালে কিস্তি মাৎ করেন। চাল দিয়েছেন অনেক ভেবে। রামকান্ত আর ভবানীর সব খবর রাখেন। ভবানীর গায়ের কটি গয়না গেল পোদ্দারের ঘরে সে খবরটি পর্যন্ত।

দিন চলে ভবানীর অলঙ্কার বিক্রী করে। ভবানী সাহস দেয়, সান্ত্বনা দেয় রামকান্তকে। তুমি রাজ্য ফিরে পেলে আবার সব হবে।

রামকান্ত ভবানীকে নিয়ে ডেরা বেঁধেছে নবাবের মঞ্জিলের কাছে। মনে আশা যদি সুযোগ পেয়ে নবাবের কাছে দরবার করা যায়। কিন্তু সুযোগটি আর আসে না। দিন যায় আশা সফল হয় না। তবুও রামকান্তর আশার শেষ নাই। মাঝে মাঝে মন খারাপ হয় বইকি! ভবানী সাহস দেয়, শক্তি যোগায়। রামকান্ত আবার ফিরে পায় উদ্যম। এমনি করে দিন চলে, চেষ্টা চলে রামকান্তর।

দয়ারাম আছেন অলক্ষ্যে। ভাবেন যাক্ আরো কটা দিন। পোড় না খেলে কি সোনা নিখাদ হয়?

ছোট্ট একটি ঘরে, ভবানীর ছোট সংসার। দাসী বাঁদী নাই, নফর চাকর লোকলস্কর নাই। দুটি মাত্র প্রাণী। সুখ নাই বটে শান্তি আছে। ভবানী নিজেই রাঁধে, নিজেই বাড়ে—পঞ্চ ব্যঞ্জন পরমান্ন নয়, শাকান্ন। স্বামীর সামনে ধরে দিতে চোখ ফেটে জল আসে। যে মুখে রাজভোগ রোচে না, সে মুখে তুলে দিচ্ছে শাকান্ন।

রামকান্তর মুখও গম্ভীর হয়।—রাজলক্ষ্মী হয়েছে রাঁধুনী! দাসী বাঁদীর সেবা নিয়ে যে থাকবে রাজপালঙ্কে সে কিনা—! অদৃষ্টের পরিহাস আর কাকে বলে। কিন্তু এই পরিহাসটি কার সৃষ্টি?

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাতের থালা টেনে নেয় রামকান্ত। ভবানী এগিয়ে আসে পাখা হাতে।

ওকি! খাও। গলা কেঁপে উঠতে চায় ভবানীর।

ওঃ হ্যাঁ!—যেন চমকে উঠে থালা টেনে নেয় রামকান্ত।

তবুও শান্তি ভবানীর সংসারে। নাটোরের রাজপুরীতে ছিল সুখে, এখানে আছে শান্তিতে। স্বামীর বুকে মাথা রেখে ঘুমায় ভবানী।

দয়ারামের মুখে হাসি ফোটে। আড়াল ঘুচিয়ে, পরদা সরিয়ে মুখ বাড়ালেন। রামকান্ত চলেছে চক বাজারের পথে। দয়ারামের

বাড়ি পেরিয়ে যেতে হয়। চক্‌মেলান বাড়ি।—দীঘাপাতিয়ার জমিদারবাড়ি, নাটোরের দেওয়ানবাড়ি। মুকসুদাবাদে ইজ্জত আছে তার।

দয়ারাম পথ আটকে দাঁড়ালেন।

—কাকা। রামকান্ত অবাক হয়, চমকেও ওঠে।—আপনি এখানে?

হ্যাঁ। দয়ারাম বললেন, এসো।

মুখ ঘুরিয়ে সামলে নিলেন চোখের জল।

একি চেহারা হয়েছে রামকান্তর!—গলার হাড় ঠেলে উঠেছে, চেখের কোলে কালি, সোনার বরণে কালির পোচ। রামজীবনের দুলাল, নাটোরের রাজকুমার—দয়ারামের বুকের ভিতর টন টন করে ওঠে।

—কাকা, আর তো পারি না। রামকান্ত ভেঙ্গে পড়ে। আপনার বউমাকে গিয়ে দেখে আসুন।

—বৌমাকে আনতে পালকি গেছে।

কিন্তু কি হবে কাকা?—রামকান্তর গলায় অভিমান।

আমি আছি বাবা!—দয়ারাম হেসে বললেন, দয়ারাম এখনও বেঁচে আছে। বুঝলে বাবা, নাটোরের দেওয়ান দয়ারাম এখনও বেঁচে। তুমি ভিতরে যাও।

দয়ারাম কুট কৌশলি।

মুকসুদাবাদে বসে ঘুঁটি চালেন, আর ছকের দান পড়ে নাটোরে। দেবীপ্রসাদের পায়ের নীচের মাটি আলগা হয়। নালিশ আসে নবাবের দরবারে। একটি নয় দু'টি নয়, একের পরে এক।

খাজনা পাঠায় দেবীপ্রসাদ, নবাব সরকারে জমা পড়ে না। মুকসুদাবাদের বাঈজীরা গিয়ে ডেরা ফেলে নাটোরে। দেবীপ্রসাদের কাঁচা মাথাটি ঘুরিয়ে দেয়। ইয়ার দোস্তও জুটেছে মন্দ নয়।

নবাব বসেছেন আমদরবারে। সবশেষে ডাক পড়ে দয়ারামের।

—দেওয়ানজি! থম থম করে নবাবের গলা। নাটোরের আবার খাজনা বাকী পড়েছে।

হুজুর আলি। দয়ারাম কুর্নিশ করে বলেন। নাটোরে এখন দুসরা দেওয়ান। দেবীপ্রসাদের আমাকে পছন্দ নয়।

বটে! নবাব বললেন, তাহলে দেবীপ্রসাদকে গদী ছাড়তে হবে।

মোওকা পেয়ে উজির সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। মোটা পেটে নাটোরের পঞ্চাশ হাজার টাকা, ভবানীর অলঙ্কার বেচা টাকা গজ গজ করছে। কাজটি হয়ে গেলে আরো কিছু প্রাপ্তি যোগের ব্যবস্থা আছে।

কুর্নিশ করে উজির সাহেব বললেন, দেবীপ্রসাদ বেতমিজ, বেয়াকুফ, বেয়াআক্কিল।

রাজ্য দেখে না ফুর্তি করে বেড়ায়: সরকারের বহুত লোকসান করেছে। দেবীপ্রসাদ গদীতে থাকলে আরো হবে।

নবাব দয়ারামের দিকে তাকালেন।

দয়ারাম বললেন,—হুজুরালি, উজির সাহেব হক কথা বলেছেন।

হুঁ! একটু ভেবে নবাব প্রশ্ন করলেন।—রাজা রামজীবনের ছেলে কোথায় আছে জানেন?

জানি। দয়ারাম বললেন; কিন্তু বহুত তকলিফে আছে হুজুর।

এৎত্তেলা পাঠান। নবাব বললেন, দরবারে হাজির হোক।

দয়ারাম খুশি মনে কুর্নিশ করে বললেন, হুজুর মেহেরবান!

—ছয়—

নাটোরের মুখে তার ভুলে যাওয়া হাসিটুকু ফিরে এলো।

রামকান্ত ফিরে এসেছে নাটোরে। এ রামকান্ত সে রামকান্ত নয়, ইয়ার দোস্তের রামকান্ত নয়। রাজা রামজীবনের রামকান্ত বাপের বেটা। কর্মচারীদের মুখে হাসি, প্রজাগণও খুসি। রাজ্য যেন এখন রামরাজত্ব। শাসন আছে, শৃঙ্খলা আছে পেষণ নাই শোষণ নাই। লোকে সূতোনুটির সঙ্গে তুলনা করে। হ্যাঁ, রাজা তো রাজা রামকান্ত! নিশ্চিন্তে থাকতে চাও তো বাপু নাটোরে চলে এসো। জলের কষ্ট? প্রজারা জল পায় না? কাটো পুকুর, কাটো দীঘি। ঘাট বাঁধিয়ে দাও। তুমি বিপাকে পড়েছ? খাজনা দিতে পারছ না? যাও না, যেয়ে রাজসরকারে হাতযোড় করে দাঁড়াও। সরকারের লোক আসবে, খোঁজ-খবর নেবে। যদি সত্যি হয় খাজনা মাপ। আর যদি মিথ্যা হয়! দয়ারামকে জান তো? হ্যাঁ, বাপু কথাটি মনে রেখো। যেমন পেঁজা তুলো, আবার তেমনি কঠিন পাষাণ।

দেখে-শুনে দয়ারামের পাকা গোঁফের আড়ালে হাসি চমকে যায়। ঢাক কেমন বাজে, না যেমন বোল ওঠে। বোল কি সহজে ওঠে? সুরে বাঁধতে হয়। দয়ারাম পাকা বাজিয়ে। ঠিক সুরে বেঁধে দিয়েছেন। এখন বোল উঠবে বইকি!

রামকান্ত বলে গাছের নীচে আছি। দয়ারাম বলেন, বাবা বুড়ো হয়েছি, এবার ছুটি নেব। রামকান্তর মুখ শুখিয়ে যায়। বলে, সেকি কাকা, আপনার হাতে বাবা আমাকে দিয়ে গেছেন। ভবানী শুনে অনুযোগ করে,—ফের ওকথা বললে আপনার সঙ্গে কথা বলব না। দয়ারাম হো হো করে হেসে ওঠেন। না মা, আর সব সইবে কিন্তু এ শাস্তি সইবে না।

দয়ারাম মায়ার বাঁধনে পড়েছেন। মাঝে মাঝে ভাবেন,—এবার বাঁধন কাটতে হবে। আর কেন। বয়স তো হলো। এখন গয়া, গঙ্গা আর কাশী।—

নাটোরের রাজলক্ষ্মী আর চঞ্চলা হবেন না, বুঝেছেন দয়ারাম। তাই বাঁধন থামাতে চান। বিধাতা অলক্ষ্যে বসে হাসেন।

ভবানীর শরীর খারাপ। বৈদ্য এসে নাড়ি টিপে প্রশ্ন করেন। শঙ্কা জাগে রামকান্তর চোখে। দয়ারামও ভাবেন।

তাইতো মা! দাড়ির আড়ালে দুষ্ট হাসিটুকু লুকিয়ে রেখে বৈদ্য মাথা নাড়েন। তোমার এ অসুখটি না হলে আমি মোহর পাব কেন?

বৈদ্যের চোখে ফুটেছে খুশির ঝিলিক।

অভিজ্ঞ দয়ারামের চোখে ধরা পড়ে। মনের খুশিতে দয়ারামের গম্ভীর মুখ ঝলমল।

ভবানীর সারা মুখে আবির ছড়িয়ে পড়ে।

চলুন দেওয়ানজি, বাইরে চলুন। বৈদ্য উঠে দাঁড়ান। এ অসুখটি মায়ের আরো আগে হলে, রাজপুরীতে এতদিনে চাঁদ নেচে বেড়াত।

বাতাসের আগে কথা ছড়িয়ে পড়ে। রামকান্তের মুখে লজ্জা-ঢাকা হাসি।

রাজপুরীর পাইক-বরকন্দাজ, নফর-বাঁদী, লোক-লস্কর এসে দাঁড়াল দয়ারামের কাছে।

—কি চাই?

—বখ্‌শিস।

দিনে দিনে ভবানীর রূপ ফেটে পড়ে। ছেলে হবে না মেয়ে হবে? ছেলেই হবে—

ছেলের বেলায় রূপের জোয়ার
মেয়ের বেলায় শতেক খোয়ার!

না হলে দিনে দিনে ভবানীর রূপ ফেটে পড়বে কেন?

মায়ার ফাঁস দয়ারামের গলায় আরো আঁট হয়ে বসল।

একটি নয় পর পর দুটি ছেলে এলো ভবানীর কোল জুড়ে। চাঁদের মত ছেলে। আনন্দের পাল তুলে দিয়েছে নাটোর রাজবাড়ি। পালটি কিন্তু ফুলে উঠতে না উঠতেই ফেঁসে গেল। ভবানীর ভরা কোল শূন্য হয়ে গেল। একটি নয়—দুটিই চলে গেল ভবানীর কোল শূন্য করে।

রামকান্ত ভেঙ্গে পড়ে।

স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে ভবানী বুকের ব্যথাকে মুখে ফুটতে দেয় না।

রাজপুরীর শোকের ছায়া পড়েছে নাটোরে।

পাড়ার মুরুব্বিরা ভাবে এ কি হলো! টোলে বসে পণ্ডিতেরা ভাবেন, তাইত! চাষী হাল চালাতে চালাতে অন্যমনস্ক হয়ে যায়। তাঁতির তাঁতের মাকুর টানা দিতে দিতে থেমে পড়ে। গঞ্জের ঝাঁকামুটে, দোকানে দোকানী, অন্দরে বউ-ঝি—সবার মনেই বিষাদের ছায়া। বর্ম-আঁটা সিপাই-শান্ত্রীর চোখেও ব্যথার ছোঁয়া।

রামের মত রাজা, লক্ষ্মীর মত রাণী—তবে! তাঁদের কেন এমন হলো? আমরা ধর পাপী-তাপী মনিষ্যি আমাদের সুখ-দুখ নিয়ে ঘর। নাটোরের লোকের মন ভার।

বর্ষার আকাশটি যেমন কালো থাকে, দিনের হাসিটি মুছে ফেলে। নাটোরবাসীদের মুখের হাসিটিও তেমন মুছে গেছে।

অপর একদিন মেঘভাঙ্গা রোদের মত সবার মুখে হাসি ফুটে উঠল।

রামকান্তের চোখে ফুটল হাসি। দয়ারাম খুশি। ভবানার চোখে কান্না হাসি। এক চোখে জল এক চোখে হাসি।

নতুন অতিথি আসছে যে কোল জুড়ে!

খুশির কথা বইকি! কিন্তু যারা বোঁটা ছেঁড়া ফুলের মত ঝরে গেল! মায়ের বোঁটা ছিঁড়ে কোল শূন্য করে? ভবানীর মনে পড়ে চোখের জল আসবে না? আবার বুঝি তারাই ফিরে আসছে মায়ের কোলে। তারা নিশ্চয় ফিরে আসবে। মা'র মুখে হাসি ফুটবে বইকি।

রাজপুরীতে শঙ্খ বেজে উঠল, উলু দিয়ে উঠল পুরনারীরা—

কিন্তু একি! একবার, দুবার তিনবার। পাঁচবার নয় তিনবার। সেবা সুখের বাস উচ্ছল হয়ে থমকে গেল। ষোল কলা পূর্ণ হতে হতে আট কলা।

তবু ভাল! নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল। ভবানীর কোলে ছেলে আসেনি, মেয়ে হয়েছে।

হয়েছে তো হয়েছে, তা আর কি হবে। তবু তো রাজপুরীর আঙ্গিনায় কচি পায়ের মলের শব্দ উঠবে রুম ঝুম রুম ঝুম। খাঁ খাঁ করা ধূসর মাঠে!

ধূসর মাঠে তৃণ-চিহ্ন। তাছাড়া এখন আর কি বা বয়েস হয়েছে রাজা রামকান্তের। বলতে গেলে এখনও ছেলেমানুষ। মা ষষ্ঠী এখনও অনেক দিন কৃপা করবেন। গাছের ডালে যখন কুঁড়ি এসেছে, একটি দুটি করে অনেক ফুল ফুটবে।

কিন্তু—

কিন্তু আর কোন নতুন অতিথি এলো না ভবানীর কোল জুড়ে। মনের আশা মনেই চাপা রইল।

মেয়ের নাম হলো তারাসুন্দরী। তা সুন্দরী বইকি! অধম বা মধ্যম নয়, উত্তম। সুন্দরীদের মধ্যেও উত্তম, সর্বোত্তমও বলতে পার।

শতপুত্র সম কন্যা। সেই কন্যা আছে ভবানীর কোল জুড়ে।

একটু একটু করে বড় হয়। যেন শুক্লপক্ষের চাঁদের কলা।

বিয়ের ফুল ফুটল তারাসুন্দরীর। বিয়ে দিলেন রামকান্ত। রাজার মেয়ের বিয়ে। কত উৎসব কত অনুষ্ঠান। অলক্ষ্যে বিধাতা পুরুষ হাসলেন। সুরে বাঁধা তারটি ঝঙ্কারে গুঞ্জন তুলবার আগে ছিঁড়ে গেল। কপাল পুড়ল তারাসুন্দরীর নতুন জীবনের স্বাদটি পেয়েও পেল না। তৃষ্ণার জল ঠোঁটে ছোঁয়াবার আগেই কে যেন কেড়ে নিয়ে গেল।

ফিরে এলো তারাসুন্দরী মায়ের কোলে।

মেয়ের বৈধব্যে রামকান্ত ভেঙ্গে পড়লেন।

আদরের মেয়ের বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকালেই ব্যাথায় বুক টনটনিয়ে ওঠে। সে ব্যাথাই বুকে বাসা বাঁধল। তারপর যাবার সময় রামকান্তের প্রাণটুকুও শুষে নিয়ে গেল সঙ্গে করে। রাজ্যপাট রেখে রাজা রামকান্ত পরপারে পাড়ি জমালেন।

শোকের উপরে শোক। আঘাতের পর আঘাত। তবুও কিন্তু দুদণ্ড চোখের জল ফেলবার সময় নাই ভবানীর। মনে যতই ভার জমুক, নামাবার অবকাশ নাই। সবার কাঁদবার সময় আছে, নাই নাটোরের রাণীর। প্রজারা এসে দাঁড়ায়—মা! কর্মচারীরা দাঁড়ায় রাণীমা। রাজা রামকান্ত নাই, আছেন রাণী ভবানী। সবাই আছে রাণীর মুখচেয়ে। চোখের জল ফিরিয়ে দিয়ে কর্তব্যের রাশটি তুলে নিলেন হাতে। যে দিকে তাকান শূন্য পুরী। আছে শুধু অক্ষয় বটের মত দয়ারাম। রামকান্তের অকাল মৃত্যুতে অস্থির দয়ারাম ভবানীর আড়ালে চোখের জল মোছেন।

পোষ্য নেয়া হবে। না হলে এই রাজ্যপাট কে দেখবে?

অনেক লোক জমা হয়েছে। ছোট বড়, ধনী গরীব—কেউবা এসেছে ছেলে নিয়ে কেউ এসেছে দর্শক হয়ে।

দয়ারামের উপরে ভার! শুধু কুলশীল হলে তো চলবে না। কাঁধটি শক্ত চাই, সোজা শিরদাঁড়া চাই।

পুতুলটি চাই কেমন? মাটির না লোহার? লোহার।

দয়ারাম দেখেন, পছন্দ হয় না। কাছে গেলে কেউবা ভয়ে কাঁদে, কেউবা মুখ লুকায়। ঘুরে বেড়ান দয়ারাম শিশু মেলায়।

হঠাৎ এক কোণ থেকে কচি গলায় হুকুম শুনে চমকে ওঠেন দয়ারাম।—শোন!

ধুতি মেরজাই পরা শিশু ভোলানাথের গম্ভীর মূর্তি। মাথায় একমাথা চুলের বোঝা। পরিপাটি করে আঁচড়ান। চোখে কাজল। ঢাকাই ধুতির কোঁচা লুটিয়ে পড়েছে। বিপদ বাধিয়েছে পায়ের নাগরা। কোনটা কোন্ পায়ের ঠিক করে উঠতে পারছে না।

দয়ারাম এগিয়ে গেলেন।

আমার জুতো ঠিক করে দাও।

হুকুম শুনে দয়ারামের মুখে হাসি খেলে গেল।

—কি হয়েছে?

—ঠিক করে পরিয়ে দাও বলছি! হুকুমের সঙ্গে ঝাঁজ মেশান!

হো হো করে হেসে ওঠেন দয়ারাম।

—হাসছ যে! পরিয়ে দাও না—

—এইযে দিচ্ছি! দয়ারাম নীচু হয়ে নাগরার পাটি ঠিক করে দিলেন।

উঠে দাঁড়াতেই হুকুম হলো, আমায় কোলে করে বাবার কাছে নিয়ে চল।

দয়ারাম কোলে তুলে নিলেন। বাবার কাছে নয়, যেখানে ভবানী অপেক্ষা করছে সেখানে।

এই নাও মা, এছেলেই পারবে নাটোরের রাশ ধরতে। আমার

ভয়ে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খায়। আর এছেলে আমাকে হুকুম করে পায়ে জুতো পরিয়ে নিয়েছে।

দয়ারাম হেসে উঠলেন। ভবানীর মুখেও হাসি।

ছেলের নাম হলো—রামকৃষ্ণ।

রামজীবনের ছেলে রামকান্ত তারপরে হলো রামকৃষ্ণ।

—সাত—

ভবানীর রাণীগিরি।

রাণী কে? রাজার ঘরনী রাণী। ঘরের সবাইকে যে দেখে সেই ঘরণী। সবাইকে দেখে কিন্তু নিজেকে দেখেনা। কেন দেখে না? না দেখবার সময় হয় না। তাহলে রাজার ঘরণী? তার তো শুধু রাজপুরীই ঘর নয়! গোটা রাজ্যটাই তার ঘর।

রাত শেষ হবার আগেই ভবানী শয্যা ত্যাগ করে, ভোর হলেই তো আবার সংসার চক্র! তার আগে জপতপ শেষ। তারপর হবে স্নান আহ্নিক, ভজন পুজন। দাসীর হাত থেকে জলন্ত মশাল নিয়ে ভোরের ফিকে অন্ধকারে ভবানী যান বাগানে। নিজের হাতে পুজার ফুল তুলতে হবে। এ হচ্ছে ভক্তির পূজা, পুরুতের দায়সারা কাজ নয়। দেখে দেখে পরখ করে চয়ন করতে হবে'সব চেয়ে ভাল ফুলগুলি। যিনি এত দিয়েছেন তাঁর জন্য এটুকু করবে না? ভজন পূজন সাঙ্গ আর কাম। কামে আত্মশুদ্ধি, নামে বল।

দুপুরে সবাই খেয়ে বিশ্রামে গেলে রাণী ভবানী নিয়ে বসেন রাজভোগ। এক মুঠো আতপ চালের ভাত আর কাঁচকলা, সঙ্গে থাকে একটু ঘি। এই ভবানীর রাজভোগ।

আহার শেষ করে ভবানী বসে সেরেস্তায়।

রাণীর পোষাক কি?—ঝলমলে।

ঝলমলে বই কি! সাদা মোটা থান আর সাদা চাদর জড়িয়ে আসেন। নাটোরের রাণীর আটপৌরে আর পোষাকী সব এই। এই পোষাকেই ভবানী ঝলমল করেন। যেন হোম শিখার একটি শীষ। রাণী নয় জননী ভবানী

দেওয়ান, কর্মচারী হাজির।

রাণীর হুকুম, আদেশ লিখে রেখেছে, এবার দিতে হবে কাজের হিসাব। চুলচেরা হিসাব ভবানীর। হিসাবটি ঠিক মত বুঝিয়ে দাও তবে ছুটি।

যে ফাঁকি দেয় না সে ফাঁকি যায় না। কোন ফাঁক নাই ভবানীর রাণীগিরিতে।

আদেশের পাশে নামটি নিজের হাতে লিখে মোহর করে দেয়।

সেরেস্তার কাজ সারা হলে ভবানী বসে বিচারে। প্রজা-পাটক এসেছে তাদের নালিশ তাদের সুখ-দুখের কথা শুনতে হবে বইকি। শুধুই কি শোনা? সঙ্গে সঙ্গে হবে ব্যবস্থা।

দেহের বল মাজা রাজার বল প্রজা। মাজায় জোর না থাকলে রাজ্যটিও থাকবে না। চাষীর লক্ষ্মী ধান আর রাজার লক্ষ্মী জন। জন হলো প্রজা।

সেই প্রজার তত্ব-তল্লাস নালিশ বিচার শেষ করে সন্ধ্যায় আবার তপজপ, ভজন-পূজন, আরাধনা নাম কীর্তন।

বাইরের শেষে ভিতরের তদারক।

রাজপুরী নিঝুম হলে, নাটোরের ঘরে ঘরে ঘুমের আস্তরণ লাগলে তবে ভবানীর রাতের আহার। একবাটি দুধ আর কিছু ফলমূল।

রাজবাড়ির পেটা ঘড়ি যখন রাত দেড়প্রহর ঘোষণা করে ভবানী ইষ্টদেবের নাম নিয়ে শয্যা গ্রহণ করে।

এই রাণী ভবানীর রাণীগিরি।

মানুষের জীবন পদ্মপত্রে নীর। কখন টুপ করে গড়িয়ে পড়ে। তখন তোমার সঙ্গে যাবে কি? এই যে দেহটা যাকে এত করে যত্ন কর, যার বড় তোমার কাছে আর কিছুই নাই, এটাকেও ছেঁড়া ন্যাকড়ার মত ফেলে যাবে। সঙ্গে যাবে? তবে এসব তোমারও নয় আমারও নয়। এসব নর নারায়ণের সেবার জন্য। মানুষই ভগবান, ভগবানই মানুষ।

ভগবানও বলতে পার নারায়ণও বলতে পার। নারায়ণের সেবা চাই।

ভবানী রাজভাণ্ডার খুলে দিলেন। রাণী ভবানী, জননী ভবানা দানে দশভূজা।

রাজবাড়ীতে অন্নসত্র খুললেন। অহোরাত্র অন্নসত্র। যারা স্বপাকে আহার করতে চায় তাদের জন্য আছে ভাণ্ডার। চাল, ডাল, তেল, ঘি, চিনি, ময়দা, নুন, মসলা, কাঠ সব আছে ভাণ্ডারে।

ভবানীর আদেশ তাঁর রাজসাহীতে, তাঁর রাজবাড়ীতে কেউ অনাহারে থাকবে না।

কর্মচারীরা জানে এ আদেশ কেমন আদেশ। সূর্য্য একদিন না উঠতে পারে কিন্তু রাণীর হুকুমটি নড়চড় হবে না।

ভবানী নিজে তদারক করে। জাতি বিচার নাই। হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, মানুষ তো? নারায়ণ ছাড়া আর কি? সবাই জানে রাণীমা আছেন। হাত পেতে শুধু হাতে ফিরতে হবেনা। না খেয়ে থাকতে হবে না।

প্রজাদের বড় জল কষ্ট! ভবানী চমকে ওঠে!—বল কি! এখনও দীঘি বা পুকুর কাটান হয় নি?

কর্মচারীরা ব্যবস্থা করে এলে ভবানী নিশ্চিন্ত হয়।

ব্যারাম পীড়া হলে প্রজাদের বড় কষ্ট। ঠিকমত চিকিৎসা হয় না। ওষুধ পায় না। ভবানীর আদেশে দাতব্য চিকিৎসা-

লয় হলো রাজসাহী জুড়ে। ওষুধের ব্যবস্থা না হয় হলো।' কিন্তু বৈদ্য ডেকে আনাতো আর চাট্টিখানি কথা নয়। এক আঁজলা কড়ি লাগে যে। গরীব গুরবোরা কোথায় পাবে ?

রাজসরকারের মাইনে করা বৈদ্যরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায়। ঘরে ঘরে যেয়ে খবর নেয়, নাড়ি টিপে দেখে, নিদান বলে দেয়।

বৈদ্য হলো ঔষধ হলো, কিন্তু পথ্য ? পথ্য না হলে শুধু ঔষধে কি অসুখ সারে ? বৈদ্যের সঙ্গে লোক আছে।—রাজসরকারের লোক। কাঁধে তার মস্ত ঝোলা মাথায় তার হাঁড়ি। ঝোলায় আছে সাবু, বালি, মিছরি, লেবু, পুরান চাল। হাঁড়িতে আছে জিয়ল মাছ।

দুর্গা পূজা এসেছে।

ভবানী বসে আছেন কাপড়ের স্তূপ নিয়ে। একটি দুটি বা একশ দুশো নয়, একহাজার দুহাজার নয় কয়েক হাজার। আহা! বছরের এদিনে ছেলেরা নতুন কাপড়ে পরবে না! আনন্দ করবে না? নতুন কাপড় নিয়ে যায় প্রজারা।

প্রতিপদ থেকে নবমী ভবানীর কুমারী পূজা। প্রতিদিন একশ কুমারী। শাড়ী আর সোনার গয়না দিয়ে কুমারী পূজা।

পণ্ডিত ব্রাহ্মণরাই বা বাদ যাবে কেন? পঞ্চাশ হাজার টাকা বরাদ্দ। যদি না কুলোয় ভয় কি, বরাদ্দ বাড়বে। অভ্যাগত প্রার্থী রাজবাড়ী থেকে শুধু হাতে ফিরবে না।

কিন্তু সবাইতো আর রাণীর কাছে সময় করে এসে উঠতে পারে না। তারা কি ফিরে যাবে? না, তারা সাক্ষাৎ করে দেওয়ানের সঙ্গে। একশ টাকা পর্যন্ত দানের অধিকারী দেওয়ান। তার বেশি হলে রাণীকে জানিয়ে নিতে হবে।

এমনি করে চলে ভবানীর রাণীগিরি।

একবার রাণী ভবানী প্রজাদের দানের আশা দিয়েছেন। সে বছর ফসল ভাল হলো না। খাজনা আদায় ভালো হলো না। নবাবের খাজনা পাঠাতেই শেষ। ভবানী খামারের শস্য বিক্রী

করলেন। তিনলক্ষ টাকা হলো শস্য বিক্রয় করে। আরো টাকা চাই। গরীব প্রজারা কি শুকনো মুখে ফিরে যাবে?

ভবানী অলঙ্কার তুলে দিলেন দেওয়ানের হাতে।

আমি মা, ছেলেরা আমার অলঙ্কার। আমি রাণী, প্রজারা আমার অলঙ্কার। এ অলঙ্কারের মূল্য তাদের মুখের কাছে তুচ্ছ।

দেওয়ানের হাতে দিয়ে বললেন, বিক্রী করে টাকা এনে দিন।

রাণীর বিশাল জমিদারিতে জমি দান করেছেন পাঁচলক্ষ বিঘা—দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর বাংলা দেশের জেলায় জেলায় সেই ব্রহ্মোত্তর দেবোত্তর এখনো আছে। সংখ্যায় কম নয়।

ভবানীর রাণীগিরি দানের রাণীগিরি। ভবানীর রাণীগিরি প্রজাদের মঙ্গলের রাণীগিরি।

রামকৃষ্ণ বড় হয়েছে।

ভবানী ছেলের হাতে রাজ্যপাট তুলে দিলেন। কাশী যাবেন।

রাজপুরীর চারদিকে প্রজার ভীড়। রাজসাহীর প্রজারা ছুটে এসেছে নাটোরে।

রাণীমা, একি শুনছি? কোন অপরাধে আমাদের ছেড়ে যাচ্ছেন? আমরা কি মাতৃহারা হব?

ভবানী আশ্বাস দেন।

রামকৃষ্ণ রইল, তোমাদের ভয় কি?

প্রজারা গুমরে ওঠে! হাজার লক্ষ কণ্ঠের গুঞ্জন।

আমরা মাতৃহারা হব না। আমরা মাকে ছাড়ব না।

ভবানী স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে জন সমুদ্রের দিকে। রাজ-র কর্মচারী লোকলস্কর, পাইক পেয়াদার চোখে জল। তাদের মনে কথা মুখ ফুটে বলেছে এই ছুটে আসা প্রজার দল।

ভবানী বলে, আমি কি তোমাদের ছেড়ে থাকতে পারি? মা কি ছেলে ছেড়ে থাকে?

বিশ্বনাথ দর্শন করে আমি ফিরে আসবো।

প্রজারা শান্ত হলো। জানে রাণীমার কথায় নড়চড় নাই।

পদ্মার জলে ভাসল নাটোরের বজরা।

সতেরশ বজরা।

রাণী ভবানী কাশী যাচ্ছেন। রাণীর মতই চলেছেন।

নদীর তীরে প্রজার ভীড়। কেউ বা বজরার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলেছে।

ভবানী দেখে আর আঁচলে চোখ মোছে। নদীর তীরে লক্ষ কণ্ঠে শব্দ ওঠে।

জয় রাণীমার জয়—জয় ভবানী মায়ের জয়—জয় আমাদের অন্নপূর্ণা মায়ের জয়। সে শব্দ কেঁপে কেঁপে বহুদূর ছড়িয়ে পড়ে।

নদীর বাঁকে বহর অদৃশ্য হয়ে যায় কিন্তু দূর থেকে ছুটে আসা জয়ধ্বনি ভবানীর কান ছুঁয়ে ছুঁয়ে বাতাসে ভেসে যায়, দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে। ভবানী স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

—আট—

একদিকে বরুণা একদিকে অসি, তার নাম বারাণসি। পঞ্চ ক্রোশ শিবধাম। বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা আছেন।

রাণী ভবানীর নৌবহর এসে থামল কাশীতে। বরুণা থেকে অসি পর্যন্ত রাণীর নৌবহর নোঙর ফেলল। নৌকা ভরা দানের সামগ্রী। ভবানী হলেন কাশীতে দ্বিতীয় অন্নপূর্ণা। প্রার্থীরও শেষ নাই দানেরও শেষ নাই।

আট মণ ছোলা ভিজিয়ে রাখেন। পথ চলতে চলতে রাহী পথিকেরা তেষ্টা পেলে জল খেয়ে যায়। সে সঙ্গে থাকে মুঠোভরা ছোলা আর গুড়। সন্ধ্যা হবার আগেই শেষ। সবাই জানে মা ভবানীর বাড়ির সন্ধান। তেষ্টা পেলেই এসে দাঁড়ায়।

গৃহবিগ্রহের পূজা হয় ষোড়শ উপাচারে। হাজার লোকের ভীড় জমে যায় প্রসাদের জন্য। পেট ভরে খেয়ে যায় অন্ন, ব্যঞ্জন, পরমান্ন, দই, মিষ্টি।

অন্নপূর্ণার মন্দিরে আছে দৈনিক পঁচিশ মণ চাল বরাদ্দ। দুঃখীরা ভিক্ষে নিয়ে যায়।

একশ আটটি করে সন্ন্যাসী, দণ্ডি ভোজন করান ভবানী। তারপর আসে কুমারী আর বিধবা। অন্নগ্রহণ করে, দক্ষিণা পায়।

ভবানীর সংসার অন্নপূর্ণার সংসার। এ অন্নপূর্ণার কাছে প্রার্থনা নিবেদন করতে হয় না, শুধু গিয়ে দাঁড়ালেই হয়।

কাশীবাস করবে বাড়িভাড়ার সম্বল নাই? রাণী বাড়ী তৈরী করে রেখেছেন। নিশ্চিন্ত হয়ে শেষের দিনগুলি কাটিয়ে দেবার আশ্রয়। একটি পয়সাও কেউ ভাড়া চাইতে আসবে না।

নাটোরের নৌকা আসেনি।

ভবানীর হাতেও তেমন কিছু নাই। কিন্তু তা বলে তো কাজ বন্ধ থাকতে পারে না।

অন্নসত্র, গৃহবিগ্রহ, দণ্ডী, সন্ন্যাসী, রাহী পথিকের ছোলাগুড়, আটা চিনি, কর্মচারীর বেতন, অসুখে ওষুধপথ্য এসব তো আর বন্ধ রাখা যায় না।

নাটোরের চিঠি এসেছে, নৌকা রওনা হলো।

রাণী ঠিক করলেন টাকা ধার করে কাজ চালিয়ে যাবেন। কিন্তু হঠাৎ এককথায় লক্ষ টাকা দেবার মত সামর্থ্য সবার থাকে না। শেঠ অমৃতলালের ছিল।

রাণী লোক পাঠালেন অমৃতলালের কাছে।

শেঠজি রাণীর উপরে বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না। রাণীর দান দেখে আফশোষ করতেন।

—আরে ভাই, জেনানার হাতে রূপেয়া পড়লে দুদিনেই পাখা মেলে উড়ে যায়। দেখ না বাংলা মুল্লুকের এই রাণীজীর কাণ্ড। এই সব বেহুদা লোকগুলোকে আস্কারা দিয়ে—মুফৎমে ভোজন-উজোন করিয়ে বিষয়-আশয় সব বিলকুল ফুঁকে দিচ্ছেন! আরে ছি ছি!—শিব! শিব!

সেই রাণীর লোক এসে দাঁড়িয়েছে শেঠজির কাছে।

শেঠজির গোফের ফাঁকে হাসি চমকে গেল। চোখ ঠেরে পাশের কর্মচারীটির দিকে তাকালেন।

দেখলে ভাইয়া! বিলকুল ফুঁক দিয়া—দেখো মেরে বাৎ।—অর্থাৎ সব শেষ করেছে, বলেছিলাম কি না! এখন আমি টাকা ধার দেই আর আমার টাকা মারা যাক। শেঠ অমৃতলাল অত কাঁচা নয়। তাহলে আর একটা গদি থেকে পঞ্চাশটা গদি বানাতে পারতাম না। মরা ঘোড়ার দাম কি!

রাণীর লোককে তাড়িয়ে দিলেন শেঠজি।

—আরে যাও যাও, কাশীতে এসে অমনি বড়মানুষি প্রথমে অনেকেই দেখায়। তারপর দম ফুরিয়ে গেলে ধার কর্জ করে কিছু দিন চালায়, তারপর একদিন মহাজনকে পথে বসিয়ে কাশী থেকে সরে পড়ে। যাও এখানে কিছু হবে না।

রাণীর অপমানে রাণীর কর্মচারীর মুখ লাল হয়ে উঠল। রাগে জ্বলে উঠল ব্রহ্মতালু। বাগ্‌দী পাইকের হাতের মুঠি লাঠির উপরে চেপে বসল। ফুলে উঠল বাবরি চুলের গোছা। চোখ হলো রক্তবর্ণ। বিচক্ষণ কর্মচারী পাইকের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখলেন। শিকারি কুকুরের মত ওৎ পেতে লক্ষ্য করছে। একটু ইসারা পেলেই শেঠজির মাথাটি চৌচির হয়ে যাবে। আরম্ভ হবে দক্ষযজ্ঞ।

রাগ সামলে নিয়ে কর্মচারী অপমান হজম করে পাইককে টেনে নিয়ে তাড়াতাড়ি পথে নেমে এলেন। শেঠজি বাংলা দেশের মানুষ নয়, তাই বাগ্‌দী পাইকের পরিচয় জানে না। চোখের পলকে অঘটন ঘটে যেতে পারে।

অমৃতলাল আত্মপ্রসাদে ও নিজের দূরদৃষ্টির কথা ভেবে গদগদ হয়ে সারা দিন কাটাল। মনের খুশিতে রাত্রিতে আরাম করে ঘুমোতে গেল।

এতদিনে শেঠজির মনের জ্বালা কিছু কমেছে।

মাঝরাতে অমৃতলাল ঘুমের ঘোরে চেঁচিয়ে উঠল—বাঁচাও—বাঁচাও। উঠে বসল। উঃ! কি ভীষণ স্বপ্ন! ঢক ঢক করে একলোটা জল খেয়ে সুস্থির হল অমৃতলাল। ভাবল, খাওয়াটা একটু বেশি হয়েছিল তাই পেটগরম হয়েছে। মনের খুশিতে আজ আহারের মাত্রাটা একটু বেশি হয়েছে অমৃতলালের। কিন্তু যতবারই ঘুম আসে ততবারই সেই একই স্বপ্ন এসে ভয় দেখায়।

অন্নপূর্ণা ক্রুদ্ধমূর্তিতে এসে দাঁড়ান। চোখে যেন আগুন ছোটে। পিছনে দাঁড়িয়ে স্বয়ং বিশ্বনাথ ত্রিশূল উঁচিয়ে।

—তুই রাণীর লোককে আজ ফিরিয়ে দিয়েছিস। রাণীকে অপমান করেছিস। যদি নিজের মঙ্গল চাস তবে রাত ভোর হতেই নিজে মাথায় বয়ে নিয়ে রাণীকে টাকা দিয়ে আয়।

ভোর রাতে অমৃতলাল উঠে বসল। ঘুমোবার আশা ছেড়ে দিল। রাত ভোর হতেই টাকার থাল মাথায় ছুটে গেল রাণীর কাছে।

রাণী তখন অন্নপূর্ণার মন্দিরে।

অমৃতলাল ছুটল অন্নপূর্ণার মন্দিরের দিকে। দরজায় দাঁড়িয়ে ভিতরে তাকিয়ে চমকে উঠল শেঠ অমৃতলাল। পাথরের অন্নপূর্ণা নীচে বসে জপ করছেন! বিগ্রহ মূর্তি থেকে জ্যোতির ধারা এসে মিশে যাচ্ছে জীবন্ত অন্নপূর্ণার দেহে।

অমৃতলাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সম্বিত পেয়ে নীরবে টাকার থলিটি নামিয়ে রেখে দরজা থেকে প্রণাম জানিয়ে চুপি চুপি সরে গেল।

এরপর থেকে রাণীর কথা উঠলেই, অমৃতলাল দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে বলে উঠত,—আরে রাণীজি তো সাক্‌ছাৎ (সাক্ষাৎ) অন্‌পূর্ণা মাঈ!

ভবানী এসেছে গয়াতে।

পিণ্ডদান করতে হবে। গয়াসুরের মাথায় আছে বিষ্ণুর পাদপদ্ম। সেখানে পিণ্ডদান না করলে পিতৃপুরুষ উদ্ধার পায় না।

হুকুম নিতে হবে টিকারির রাজার। গয়াধাম টিকারির জমিদারির ভিতরে।

তীর্থযাত্রীদের পিণ্ডদানের অনুমতি দিয়ে টিকারি রাজ মোটা টাকা পায়।

ভবানীর কাছে পাঁচলক্ষ টাকা দাবী করলেন টিকারি রাজ। বলে পাঠালেন এক পয়সাও কম হবে না।

বৃদ্ধ আলিবর্দি তখনও মসনদে বসে। রাণী লোক পাঠালেন নবাবের কাছে! নবাবের উত্তর নিয়ে লোক ফিরে এল।

রাজা রামজীবনের পুত্রবধূ নবাবেরও পুত্রবধূ। তাঁর অপমান নবাবের অপমান। নবাব সসৈন্যে আসছেন কৈফিয়ৎ তলব করতে।

সংবাদ পেয়ে টিকারি রাজের টাকার নেশা ছুটে গেল। প্রাণের দায় বড় দায়। ছুটে এলেন ভবানীর কাছে।

এমন হবে জানলে কি আর কেউ বাঘের গায়ে খোঁচা দেয়! রাণীর শরণ নিলেন টিকারি রাজ।

মা আমার অপরাধ হয়েছে ক্ষমা করুন। আপনি পিণ্ডদান করে নির্বিঘ্নে চলে যান। আপনি আজ থেকে রাজ অতিথি।

আরার রাণীর লোক ছুটল মুর্শিদাবাদ।

নবাব বললেন ঠিক হ্যায়। রাণীর কাছে ক্ষমা চেয়েছে আমি বহুৎ খুশি হয়েছি। রাজাকে ক্ষমা করলাম।

টিকারি রাজকে জানালেন।

তোমার গোস্তাকি নাটোরের রাণীর ফরমায়েশ মাফিক মাপ করা গেল। কিন্তু হুঁশিয়ার থেকো। বারদিগর এরকম হলে তোমার টিকারি আমি ময়দান করে দেব। মনে রেখো আলিবর্দি বুড়ো হলেও তলোয়ারের ধার কমেনি।

টিকারি সেলাম জানিয়ে উত্তর দিল, বহুৎ হুজুর!

রাজ অতিথি রাণী ভবানী। রাজার লোক দাঁড়িয়ে থাকে দরজায়। পিণ্ড দান করে খুশি হয়ে তিনলক্ষ টাকা পাঠিয়ে দিলেন ভবানী।

টাকা পেয়ে রাজা আঁৎকে উঠলেন।

আরে বাপ্! আমার ঘাড়ে কটা মাথা? রাণীমা আমার মান বাঁচিয়েছেন প্রাণ বাঁচিয়েছেন। আমার রাজ্যপাট বেঁচেছে।

ভবানী বলে পাঠালেন তিনি খুশি মনে দান করছেন। তীর্থস্থান রক্ষা করতে রাজার খরচ হয়। তার কিছু সাহায্য মাত্র করা হলো। রাজা যদি ফিরিয়ে দেন তবে তিনি মনে করবেন রাজা তার উপরে এখনও নারাজ।

ফল্গু নদীর ধারে গয়া।

ফল্গু অন্তঃসলিলা। বালির নীচে জল। জল চাইলে বালি খুঁড়তে হয়। যাত্রীদের বড় কষ্ট হয়। বালি খুঁড়ে জল নিয়ে স্নান করে তবে শ্রাদ্ধ শান্তি পূজা অর্চনা। ভবানী কয়েকটি গ্রাম কিনে নিলেন। চাষীদের এনে সেই গ্রামে বসালেন। তাদের সঙ্গে চুক্তি, প্রত্যেক দিন ভোর হবার আগেই ফল্গুর বালি খুঁড়ে কুয়ো বানিয়ে রাখতে হবে। যতদিন তারা একাজ করবে ততদিন বংশ পরম্পরায় জমি নিষ্কর ভোগ দখল করবে।

ভবানী ফিরে এসেছেন নাটোরে।

টিকারির লোক এসে দাঁড়াল হাত জোড় করে।

মা মহারাজের বড় বিপদ। এ বিপদে তিনি আপনার শরণ নিয়েছেন। আপনি ছাড়া কেউ তাঁকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারবে না।

একজন দুর্মুখ কর্মচারী বলে উঠল, রাণীমাকে অপমান করবার সময় মনে ছিল না?

ছিঃ! ভবানী তিরস্কার করলেন কর্মচারীকে। শরণাগতের মনে দুঃখ দিতে নাই। না ভাবে, না ভাষায়, না কাজে।

মা! টিকারির লোক বলল, মহারাজকে নবাব কয়েদ করেছেন।

কেন?

এবার আদায় ভাল হয়নি। নবাব সরকারের খাজনা পাঠাতে পারেননি মহারাজ।

খাজনা দাখিল না হলে নবাব রাজা জমিদারদের কয়েদ করতেন।

রাণী খাজনার টাকা পাঠিয়ে টিকারি রাজকে মুক্ত করলেন।

মুক্তি পেয়ে টিকারি রাজ মাথার পাগড়ীটি ভবানীর কাছে পাঠিয়ে দিয়ে চিরদিনের জন্য আনুগত্য জানালেন।

মা আমি আপনার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিনি। অহঙ্কারে ডুবে ছিলাম। আমার মোহ মুক্তি হয়েছে। আমি আপনার অনুগত সন্তান।

রাণী ভবানী শরণাগতের জননী।

—নয়—

রোগে ভুগতে ভুগতে ১৭৫৬ সালের এপ্রিল মাসের নয় তারিখে বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব আলিবর্দি বেহস্তের পথে পাড়ি দিলেন। পড়ে রইল রাজ্যপাট, আদরের নাতি মসনদে বসলেন, নবাব মনসুরালি মোলক সিরাজদ্দৌলা শাহকুলিখাঁ মীরজা মোহম্মদ হায়বৎজঙ্গ বাহাদুর। সে দিকে তাকিয়ে মতিঝিল প্রাসাদে বসে দুটি মানুষের চোখ জ্বলে উঠল পিলসুজের উপরে প্রদীপের মত। মাঝে মাঝে কেঁপে ওঠে, মাঝে মাঝে স্থির হয়, আবার দপ দপ করে জ্বলতে থাকে।

একজন নবাবের মাসী ঘসেটি বেগম আর একজন পিয়ারের রাজবল্লভ, নবাবের দেওয়ান।

আলিবর্দি বেঁচে থাকতেই ঘসেটি বেগম বোনপোর বিরুদ্ধে একবার চক্রান্তের জাল বিছিয়ে ছিলেন।

সিরাজ সে কথা ভোলেনি।

একদিন মতিঝিলে চড়াও হয়ে ধনসম্পত্তি সহ মাসীকে নিজের অন্তঃপুরে নিয়ে এলো। আদর করে নয় বন্দি করে। মাসী রইলেন অন্তঃপুরে বন্দি হয়ে, আর ধনদৌলৎ গেল সিরাজের কোষাগারে।

রাজবল্লভ বুঝলেন এবার তার পালা। নবাব সরকারের কত টাকা যে রাজবল্লভের মোটা পেটে বাসা বেঁধেছে, তার হিসাব নাই। একবার ধরা পড়ে আলিবর্দির কৃপায় কোন রকমে জান ও মান বেঁচেছে। সিরাজই ছিল সেবারের উদ্যোক্তা। রাজবল্লভ বলেন এবার বাঁচাবার জন্য আলিবর্দি নাই।

কোম্পানির সঙ্গে দহরম আছে রাজবল্লভের। ধনসম্পত্তি দিয়ে গোপনে ছেলে কৃষ্ণদাসকে পাঠিয়ে দিলেন কলকাতায়।

রতনে রতন চেনে। খুঁজে বার করতে সময় লাগেনা। রাজবল্লভ ভিড়ে গেলেন মীরজাফরের দলে।

সিরাজের বিরুদ্ধে বেশ একটি ষড়যন্ত্র দানা বেঁধে উঠেছে। দলের মধ্যে মণি হলো মীরজাফর। চারিদিকে আছে কৃষ্ণচন্দ্র, জগৎশেঠ, মাণিকচাঁদ, উমিচাঁদ বা আমিরচাঁদ, রায়হুর্লভ, লুৎফার্খা বা ঈয়ার লতিফ। এবার দলভারী করলেন রাজবল্লভ।

এদিকে সুযোগ পেয়ে সুতোনুটিতে ইংরাজরাও গুছিয়ে বসেছে। এখন চলেছে মীরজাফরের সঙ্গে লেনদেন, দর কষাকষি।

দিনে দিনে বাড়ছে সহর কলকাতা। সুতোনুটি, গোবিন্দপুর আর কলকাতা নিয়ে হয়েছে আধুনিক কলকাতা। কলিযুগের অমরাবতী। বসতি বেড়েছে, নতুন নতুন দপ্তর খুলেছে, কর্মচারীর চাহিদা বাড়ছে। কলকাতা গেলেই কাজ। কোম্পানির লোকেরাই খুঁজে নিয়ে কাজ দেয়। চারদিকে বিরাজ করছে নিয়ম শৃঙ্খলা, ছিমছাম।

নন্দরাম সেন, জনার্দন শেঠ, গোবিন্দ মিত্র, বনমালী সরকার. কৃষ্ণচন্দ্র, জগৎশেঠ, হুজুরীমল, নকুধর, আমিরচাঁদ শোভাবর্দ্ধন করছেন কলকাতার—আলো করেছেন কোম্পানির চোখের অন্ধকার।

ঘন ঘন মন্ত্রণা সভা বসে। কখনো কোম্পানির ঘরে কখনো জগৎ শেঠের কুঠিতে। নদীয়ার মহারাজ এসে যোগ দিলেন মন্ত্রণাসভায়। সোনায় সোহাগা পড়ল!

সিরাজ এদের কাছে কোন প্রত্যক্ষ অপরাধে অপরাধী নয়। তবুও দিনের পর দিন এরা সিরাজের মুণ্ডপাতের জন্য কোম্পানির সঙ্গে শল্লা পরামর্শ চালাতে লাগলেন।

বাংলা জুড়ে রাণী ভবানীর জমিদারি। নবাব সরকারের সঙ্গে দহরম মহরম। লোক, লস্কর, সিপাহি, পাইক, বরকন্দাজ, ধন, দৌলৎ কোনটাই তুচ্ছ করবার মত নয়। সবার উপরে বাংলা জুড়ে রাণীর খ্যাতি। এমন একজনকে দলে টানতে পারলে লাভ বইকি!

জগৎ শেঠের লোক এলো চিঠি নিয়ে।

চিঠি পড়ে উত্তর লিখে দিলেন ভবানী।

—খাল কেটে কুমীর এনো না। অজানা দেবতার চেয়ে জানা শয়তান নিরাপদ।

উত্তর নিয়ে লোক ফিরে গেল কলকাতা। মুখের মত উত্তর পেয়েও লজ্জা হয়নি কুচক্রী শিরোমণিদের।

কুচক্রীরা থামল না। তারা রাণীকে দলে টানবার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করতে লাগল। নানা রকম লোভনীয় প্রস্তাবও পাঠাতে লাগল রাণীর কাছে। কুচক্রীদের কেহ কেহ রাণীর সাক্ষাৎ প্রার্থনাও করল।

রাণী ভবানী সবই প্রত্যাখ্যান করলেন। লোক আসে, রাণীর কড়া জবাব নিয়ে ফিরে যায়। রাণীর মন টলে না। কেন টলবে? তিনি দেশকে ভালবাসেন, দেশের লোকদের ভালবাসেন আর ভালবাসেন তাঁর নাটোরকে। নতুন নবাবের নানা কীর্তি কাহিনী রাণীর কানে আসে। কুলবধুরা নতুন নবাবের ভয়ে সশঙ্কিত থাকে তিনি জানেন। নতুন নবাবের অত্যাচার দিন দিন বেড়ে চলেছে একথাও তিনি শুনেছেন। তবুও তো সে নবাব। এই দেশের মানুষ, দেশের শাসনকর্তা।

রাণী জানেন নবাব আলিবর্দির অনুগ্রহে তাঁরা নাটোর রাজ্য ফিরে পেয়েছেন। তাই নবাবের প্রতি রাণীর আনুগত্য থাকাই

স্বাভাবিক। তিনি ন্যায়ের পথে চলতে চান। নতুন নবাব সিরাজদৌল্লা তো আলিবর্দি খাঁর দৌহিত্র। বিপদের সময় তিনি নবাবের বিরুদ্ধাচারণ করতে চাইলেন না।

রাজা রাজবল্লভ এবং আরও অনেকে রাণীর কাছে আবার বিনীত অনুরোধ করে পাঠাল। রাণীকে উপস্থিত হতে হবে তাদের সভায়।

জগৎ শেঠের বাড়ীতে গোপন সভা বসেছে। কুচক্রীরা সবাই হাজির। রাণী এসে দাঁড়ালেন সভার ধারে চিকের আড়ালে।

অত্যাচারী নবাব। নবাবের শয়তানি দিন দিন বেড়েই চলেছে। নবাবকে শায়েস্তা করা দরকার। একজন কুচক্রী বলল, শায়েস্তা কি অমনি হবে। ইংরেজদের সঙ্গে হাত মেলাতে হবে। দেশে নিয়ম-শৃঙ্খলা, শান্তি আনতে হলে এছাড়া আর পথ নেই। ইংরেজদের ফৌজ নবাবের ফৌজকে সহজেই কাবু করবে। উদ্ধত নবাব মুখের মতো জবাব পাবে।

নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র অনেকদিন ধরে চলছে—রাণী এখন টের পেলেন।

দূরে থেকেও তিনি ষড়যন্ত্রের কথা কিছু কিছু শুনেছিলেন। এখন চোখের সামনে এই সব চক্রান্তকারীদের দেখলেন।

রাণী বললেন, দেশের রাজা অত্যাচারী হলে তাঁকে নিবৃত্ত করার আরও অনেক উপায় আছে। তা না করে বিদেশী শয়তানদের ডেকে আনা উচিত নয়।

এই বলে রাণী সে স্থান ত্যাগ করেন।

পলাশীর যুদ্ধ শেষ হয়েছে।

ক্লাইভের গর্দভ বসেছে বাংলা-বিহার উড়িষ্যার সিংহাসনে। ছোট নবাব মীরণের পীড়নের স্রোত বয়ে চলেছে অবাধে

বাংলার বুকে। সিরাজকে খুন করিয়েছে, বেগমদের নৌকার তক্তা খুলে মাঝ গঙ্গায় ডুবিয়ে মেরেছে। কেউ মুখ ফুটে প্রতিবাদ করার সাহস পায় নি। বড় নবাব আফিংয়ের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকেন। ছোট নবাব তার চোখের মণি। বিচার করে কে? শাস্তি দেয় কে? দেনেয়ালা আছেন। তিনিই দিলেন। বিশ্বাসঘাতকের দল কেউ রেহাই পায়নি তার অমোঘ দণ্ড থেকে।

বজ্রাঘাতে মীরণের দেহ দগ্ধ হলো।

মীরজাফরের অঙ্গ খসে পড়ল গলিত কুষ্ঠ ব্যাধিতে। অথর্ব অর্ধ উন্মাদ মীরজাফরের মৃত্যু বড় করুণ।

উমিচাঁদ প্রায়শ্চিত্ত করল উন্মাদ হয়ে। বোকা বোবা হয়ে পথে পথে ভিখারির মত ঘুরে বেড়াল মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত।

জগৎ শেঠ শেষ জীবন কাটায় অর্ধ উন্মাদ হয়ে।

রাজবল্লভ বোধশক্তি রোহিত হয়ে পরপারে যাত্রা করে।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র দেহত্যাগ করে মুঙ্গেরের কারা অন্তরালে।

ওয়াটসের মৃত্যু আকস্মিক।

ক্লাইভ আত্মহত্যা করে।

বাংলা জুড়ে চলেছে অরাজকতা। যেমন বেড়েছে ইংরাজের ঔদ্ধত্য, তেমন বেড়েছে চোর, ডাকাত, ঠ্যাঙ্গাড়ের উপদ্রব; বাংলার লোক সশঙ্ক জীবন কাটায়। একমাত্র ব্যতিক্রম নাটোর। ভবানীর শাসনে যেমন দয়া আছে, তেমন কঠোরতাও আছে। আর আছে দূরদৃষ্টি। অনেক আগে থেকেই ঘটনার গতি লক্ষ্য করে ব্যবস্থা করে রাখেন।

তাই নাটোর রাজসাহীতে নাই বাংলার অশান্তি। প্রজাদের গায়ে আঁচড় লাগে না। নবাব খাজনা পেলেই খুশি। প্রজা রাজা জমিদারের সঙ্গে নবাবের সম্পর্ক টাকার। খাজনা পেলেই

নবাব সরকার খুশি। মাঝে মাঝে হয়ত দু্একটা ফরমান আসতে পারে, কিন্তু ব্যবস্থা অনুসারে কাজ হচ্ছে কিনা দেখার মাথা-ব্যথা নবাব সরকারের নাই। খাজনার টাকা ফেলে দিয়ে তুমি যা খুশি কর। সরকারের সেসব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নাই। টাকা পেলেই সব ঠিক।

দেশ শাসন করে নবাব, খাজনা নেয় ইংরাজ।

কোম্পানি দেওয়ান নবাব হলেন নাজিম।

রাজনৈতিক, সামাজিক, আর্থিক বিশৃঙ্খলায় দেশ ডুবে গেল। ফন্দীবাজ, ফিকিরবাজরা মাথায় বসল। ভাল সৎলোকেরা তলিয়ে গেল।

কলকাতার গবর্ণর ছিলেন মিঃ ভেরলেস বলে একজন ভদ্রলোক। তিনি বিদায় নিলেন।

তক্তে বসল জন কার্টিয়ার। সময়টা ১৭৬৯ থেকে ১৭৭২ সাল। এরপর এলেন স্বনামধন্য হেস্টিংস সাহেব।

নবাব পেষণ করেন, পেষণের প্রধান হাতিয়ার রেজা খাঁ। মীরজাফরের রাজস্ব বিভাগের দেওয়ান। ইংরাজেরা শোষণ করে। সাহেব মাত্রই সেদিন এক একটি কোম্পানি। এর উপরে প্রকৃতি হলেন বিরূপ।

দেখা দিল ছিয়াত্তর মন্বন্তর।

> 'নদনদী খালবিল সব শুকাইল।
> অন্নাভাবে লোক সব যমালয়ে গেল॥
> দেশের সমস্ত চাল কিনিয়া বাজারে।
> দেশ ছারখার হলো রেজাখাঁর তরে॥
> একচেটে ব্যবসা দাম খরতর।
> ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হলো ভয়ংকর॥
> পতি পত্নী পুত্র ছাড়ে পেটের লাগিয়ে।
> মরে লোক অনাহারে অখাদ্য খাইয়ে॥

ভবানী রাজভাণ্ডারের চাবি খুলে দিলেন। অন্নসত্র খুললেন রাজপুরীতে—রাজপুরীর বাইরে—নাটোরের বাইরেও। যারা আসে তারা বাঁচে, যারা আসে না তারা বাঁচে না।

বাংলা দেশের এক-তৃতীয়াংশ লোক এই মন্বন্তরে অনাহারের বলি।

ভবানী নিজের সংক্ষিপ্ত আহার আরো সংক্ষেপ করলেন। কেউ আপত্তি করলে শুধু বলেন, ছিঃ!

তিরস্কারই বল প্রতিবাদই বল, ঐ একটি মাত্র কথা—ছিঃ! তাই যথেষ্ট। এ তো আর তোমার আমার মুখের কথা নয়। ভবানীর কথার ওজন কত! হাজার কথার চেয়েও ওজনে ভারী। যারা বলে তারা লজ্জা পেয়ে সরে যায়। আরো দু'বার ছিঃ শুনেছে নাটোর রাজপুরী। একবার রামকান্তর মৃত্যুর পরে। আর একবার টিকারি-রাজ কয়েদ হলে।

ভবানীর বেশভূষা মোটা সূতির থান আর চাদর।

রাণী বিধবা হলেও রাণী। রেশমী থানের কথা বলতে যেয়ে পুরনারীরা আর একবার শুনল ছিঃ! টিকারি-রাজের পত্রবাহক এলে দুর্মুখ কর্মচারীরা শুনেছে—ছিঃ। ছিয়াত্তর মন্বন্তরে ভবানী আর একবার বললেন,—ছিঃ!

অভুক্ত ছেলে ফেলে কোন মায়ের থাকে আহারে স্পৃহা? না থাকে তার খাদ্য লিপ্সা? একটি দুটি নয় আজ হাজার হাজার অভুক্ত ছেলেরা উন্মত্তের মত ছুটে আসছে মায়ের কাছে, তাদের জননীর কাছে।

নাটোরের রাণী আজ সারা দেশের মা জননী।

অহোরাত্রের জন্য বিশ্রামকে ছুটি দিয়েছেন ভবানী। সঙ্গে আছে তারাসুন্দরী। মায়ের পিছনে ছায়ার মত থাকে। রামকৃষ্ণও এসে দাঁড়ায় কখন কখন।

—তারা! তারা। রামকৃষ্ণ উঠে দাঁড়ায়। মা সব ঠিক আছে?

—হাঁ, বাবা।

তারা! তারা! রামকৃষ্ণ ফিরে যায়। সাক্ষাৎ তারা নিজের হাতে ভার নিয়েছেন, বেঁচে গেল লোকগুলি।

রাজা রামকৃষ্ণ সন্ন্যাসী মানুষ। শুধু আচারে নয় বিচারেও। বিষয়ে মোহ নাই। যা করেন মা।

সব ছেড়েও ভবানী তাই কিছুই ছাড়তে পারেনি। শুধু রাজ্য-পাট নয়, সংসার বিরাগী ছেলেটিকেও দেখতে হয়। যত চান দূরে সরে যেতে সংসার ততই টেনে রাখে রাণীকে।

রাজভাণ্ডার শূন্য হয়ে এসেছে। কর্মচারীরা বলে, রামকৃষ্ণ নির্বিকার। যারটা তিনিই করছেন, মা আছেন।

কর্মচারীরা চুপ করে যায়। দয়ারাম বেঁচে নাই। সবাই চুপ করে থাকে।

চাল যোগাড় করতে হবে। যোগাড় হবে কিনে। কিন্তু কি ভাবে কিনবে? চাষীর ধান চাল রেজা খাঁর গুদামে। হাট, বাজার, গঞ্জে একদানা চাল নাই।

রাণী লোক পাঠালেন।

রেজা খাঁ চাল দেয়। এক টাকার চাল দশ টাকা।

রাজকোষের অর্থ গেল রেজা খাঁর পকেটে। তবু আরো চাল চাই। ভবানীর গায়ের অলঙ্কার শেষ রাতের তারার মত একটি একটি করে অদৃশ্য হলো। সরকারী খাজনা বাকী পড়তে লাগল। ভবানীর অন্নসত্র বন্ধ হলো না। যদি এতেও না হয়, তবে মহল বন্ধক দিতে হবে। ক্ষুধার্তকে আহার দিয়ে বাঁচাতে হবে।

লোক বাঁচল। নিসম্বল হলো ভবানী। গায়ের অলঙ্কার গেছে, রাজকোষের অর্থ গেছে, খামারের শস্য গেছে, সরকারী খাজনা বাকী পড়েছে।

কর্মচারীরা ভাবে এবার বুঝি জমিদারি যায়। নবাবী আমল থাকলে কয়েদ হতো। ইংরাজি আমলে কয়েদ হয় না জমিদারি যায়।

রামকৃষ্ণ নাই।

কর্মচারীরা এসে দাঁড়াল ভবানীর কাছে।

—মা কি হবে?

—ভয় নাই, আমি আছি।

হাঁ, আছেন বটে ভবানী। বসুন্ধরার মত সর্বংসহা।

কোলের ছেলে কোলশূন্য করে চলে গেল। স্বামী গেল। মেয়ের কপাল পুড়ল। শেষে রামকৃষ্ণকেও তাঁর ইষ্টদেবী টেনে নিলেন। সহ্য করেছেন ভবানী। আবার সহ্য করলেন। নাটোরের ভার তুলে নিলেন হাতে। যেমন করে একবার নিয়ে ছিলেন রামকান্তের তিরোভাব হলে।

বলেন, ভয় নাই আমি আছি।

কর্মচারীরা ভরসা পায়। নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে যায়।

ধীরে ধীরে ছিয়াত্তর মন্বন্তরের প্রকোপ মিলিয়ে যায়। ইংরাজদের গবর্ণর হয়েছে, কাশিমবাজারের কান্তবাবুর পান্তভাত খাওয়া হেষ্টিংস সাহেব।

সিরাজের তাড়া খেয়ে হেষ্টিংস কাশিমবাজার থেকে পালায়। এখনও লোকে সে কথা মনে করে ছড়া কাটে।

হাতীপর হাওদা
আর ঘোড়া পর জীন,
জল্‌দি আও জল্‌দি আও
ওয়ারেন হেষ্টিংস।

হাতীতে হাওদা কষা আছে, ঘোড়াতেও জীন আঁটা আছে, জল্‌দি এসে, যেটায় সুবিধা পাও সরে পড়। না হলে এবার

গেলে। সেই হেষ্টিংস দিশেহারা হয়ে কান্তমুদির আশ্রয় নিল।

কান্তবাবু ছিলেন কাশিমবাজার কুঠির মুহুরি।

'হেষ্টিংস সিরাজ ভয়ে হয়ে মহাভীত।
কাশিমবাজারে গিয়া হন উপনীত॥
কোন্‌স্থানে গিয়া আজ লইব আশ্রয়।
হেষ্টিংসের মনে এই নিদারুণ ভয়॥
কান্তমুদি ছিল তার পূর্বে পরিচিত।
তাহারি দোকানে গিয়া হন উপনীত॥
নবাবের ভয়ে কান্ত নিজের ভবনে।
সাহেবে রেখে দেয় পরম গোপনে॥
সিরাজের লোক তার করিল সন্ধান।
দেখিতে না পেয়ে শেষে করিল প্রস্থান॥
মুশ্‌কিলে পড়িল কান্ত করে হায় হায়।
হেষ্টিংসে কি খেতে দিয়ে প্রাণ রাখা দায়?
ঘরে ছিল পান্তাভাত আর চিংড়ি মাছ।
কাঁচা লঙ্কা, বড়ি পোড়া আছে কলা গাছ॥
সূর্যোদয় হল আজি পশ্চিম গগনে।
হেষ্টিংস ডিনার করে কান্তর ভবনে॥

সেই স্বনামধন্য হেষ্টিংস সাহেব এবার হলেন কোম্পানির কাণ্ডারি। সব ঢেলে সাজলেন। রেজা খাঁর বিষ দাঁত ভাঙল। নবাবের নাজিমি গেল। দেশের নায়েব নাজিম হর্তাকর্তা সব কোম্পানি ইংরাজ।

তারা শোষণ করে হাঙ্গামা হুজুত করে না। গলা কাটতে গেলে, তোমার গলাটি এমনি ভাবে কেটে নেবে যে আগে মোটেই বুঝবে না। গলাটি কেটে নিয়ে গেলে বুঝবে যে গলাটি নাই। এমনি তাদের কাজ। আইন কানুন বলে একটা বাঁধান তারা মেনে চলবে, যতক্ষণ তাদের স্বার্থে আঘাত না লাগছে। না হলে

তারা বড় ন্যায় বিচারক। স্বার্থে আঘাত না দিয়ে তাদের সঙ্গে একহাত লড়ে যেতে পার।

লড়েছিলেন বটে রাণী রাসমণি। জানবাজারের রাণী। একবার নয় দুবার। কলকাতার বুকে বসে কোম্পানির আইন দিয়েই কোম্পানির কান মলে দিয়েছিলেন। নাকে খৎ দিয়ে ইংরাজ সেদিন হাড়ে হাড়ে চিনেছিল রাসমণিকে।

গঙ্গায় শেকল ফেলে পথ আটকালেন রাসমণি। ইংরাজের জাহাজ যেতে পারবে না। বলেন আমার জায়গায় আমি শেকল ফেলেছি, তুমি কে হে বড় যে চোখ রাঙ্গাচ্ছ?

তা হবে না—ইংরাজ বলল, জাহাজ যাবে কি করে? এ কাজটা ঠিক হচ্ছে না।

বটে! উত্তর দিলেন রাসমণি, আমার জলে আমার প্রজারা মাছ ধরে, তোমরা তাদের কাছে শুল্ক চাও কোন আইনে শুনি? পিছু হটল কোম্পানি।

আর একবার পূজার বাজনা বাজিয়ে মিছিল করতে দেবে না। ইংরাজ ভদ্রলোকদের শান্তির ব্যাঘাত হয়। রাসমণি বেড়া দিয়ে জানবাজারের রাস্তা বন্ধ করে দিলেন।

ইংরাজ বলল,—বেড়া তোল।

রাণী বললেন,—কেন তুলব? আমার জমিতে আমি বেড়া দিয়েছি। কারু পাকা ধানে আমি মই দিতে যাই নি।

ইংরাজ বলে,—আমরা যাব কি করে?

রাণী বলে,—তার আমি কি জানি। যেখান দিয়ে খুশি যাও, শুধু আমার বেড়া টপকে যেয়ো না। ইংরাজ আবার পিছু হটল। হটবে না? যাতায়াতের সদর রাস্তাটি যে রাসমণির জমির উপর দিয়ে।

—দশ—

পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরাজদের সাহস আরও বেড়ে গেল। কোম্পানির রাজত্ব চলতে লাগল পুরাদমে। দেশে তো আর নবাব বাদশা নেই যে ঠেকাবে।

এসেছিল ব্যবসা করতে পেয়ে গেল রাজত্ব। ইংরাজদের কথা আর কি!

ছোট ছোট রাজা জমিদারদের ওপর কোম্পানির হুকুম হল। নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে খাজনা জমা দিতে হবে। এর ব্যতিক্রম হলে জমিদারি থাকবে না। অন্য লোককে বন্দোবস্ত দেওয়া হবে। হুকুম পেয়ে দু'এক জন জমিদার রুখে দাঁড়িয়েছিল।

কিন্তু ঐ পর্যন্ত!

কোম্পানি সহজেই তার সমাধান করে দিল।

এরপর যাকে সন্দেহ হয় কোম্পানির লোক তাকে কয়েদ করে। ধীরে ধীরে দেশের শাসন ব্যবস্থা কোম্পানি নিজের মুঠোর ভেতর আনতে লাগল।

বেশি মাইনে দিয়ে কোম্পানি অনেক লোক পুষত। এদের কাজ ছিল নানা খবর দিয়ে কোম্পানিকে সজাগ রাখা। তাছাড়া দেশের কোথায় কি পাওয়া যায় তাও জানাতে হত।

এদেশে এখনও কোম্পানির আমলের কথা শুনা যায়। এই সে কোম্পানি যারা ধীরে ধীরে দেশের শাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করে আর রাজ্য বিস্তার করে চলে।

কোম্পানি বলতেই ইংরেজদের লোক। প্রথম প্রথম ইংরেজরা

এ দেশের লোককে বিশ্বাস করত না। অবশ্য তাদের মতের পরিবর্তন হতে দেরি হয় নি।

নাটোরের জমিদারির কথা কোম্পানি আগেই শুনেছে। নাটোর কেন আরও অনেক শাঁসাল জমিদারির কথা কোম্পানি চিন্তা করছে। কোম্পানির আয় কতটা বাড়বে তারও হিসাব নিকাশ হচ্ছে।

নাটোরের রাণীকে শ্রদ্ধা করে কোম্পানি।

সব খবর তারা রাখে। রাণী মীরজাফরকে যে উচিত কথা বলে পাঠিয়েছিলেন কোম্পানি সে কথা জানে। মন্বন্তরে দেশের লোকের প্রাণ বাঁচার চেষ্টা দেখেছে। রাণীর দানের খবর রাখে। তাই শ্রদ্ধা করে রাণীকে। কিন্তু রাণীর খাজনা বাকী পড়েছে এগার লক্ষ টাকা। ভেবে দেখ একটি দুটি নয়, মোটা টাকা। বেনিয়ার জাত ইংরাজ! শ্রদ্ধাভক্তি যতই করুক, টাকা চেনে। টাকার জন্যই এদেশে আসা।

বলল,—টাকা চাই।

ভবানীর কাছে কোম্পানির নোটিশ এলো। খাজনার টাকা শোধ দেবার তাগিদ। একেবারে ঘড়ির কাঁটায় দিনক্ষণ তারিখ সব হিসাব করে।

নবাব হলে কয়েদ করত। ইংরাজ কোম্পানি জমিদারকে কিছু বলে না, বলে জমিদারিকে।

শোর সাহেব বলে একজন ইংরাজ ভদ্রলোকের উপরে ভার ছিল জমিদারের খাজনা আদায় করার। শোর সাহেব সোরগোল তুললেন।

কোম্পানির নোটিশ পেয়ে নাটোর সরকারের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো।—অমুক দিন, এত তারিখের এতটার মধ্যে বাকী

খাজনা পরিশোধ না করলে, দুঃখের সঙ্গে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হব।

কথাটি বুঝে দেখ, দুঃখের সঙ্গে! যেন জুতো মারবার আগে জিজ্ঞাসা করে নেওয়া হচ্ছে,—মশায় আপনাকে এক ঘা জুতো মারব, অনুগ্রহ করে অনুমতি দিন!

শিয়রে শমন। কিছুটা সময় হাতে পেলে ব্যবস্থা করা যেত। রাজকোষে অর্থ নাই, রাণীর অলঙ্কার নাই, খামারে শস্য নাই—খাজনা শোধ করবার উপায় কি?

ধান ফুরোল, পান ফুরোল, খাজনার উপায়?—বর্গীরা খাজনা পেলেও যেত না পেলেও যেত। কিন্তু সাদা বর্গীদের কুষ্ঠিতে চলে যাওয়া লেখে না।

শোর সাহেব ঠিক করেছেন নাটোরের জমিদারি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে নতুন লোকের কাছে পত্তন দেওয়া হবে। এগার লক্ষ টাকা আদায় হবে। তাছাড়া কোম্পানির সঙ্গে সঙ্গে নিজের পকেটেও দু'পয়সা আসবে।

জমিদারি কি আর অমনিই পত্তন নেওয়া যায়! সরকারী খাজনা তো দিতেই হবে। আর সরকারী লোকেদের? তাদের জন্যও কিছু রেস্ত ছাড়তে হবে বইকি! পূজা কি আর অমনি হয়, সবার আগে গণেশ ঠাকুরের পূজাটি সেরে নিতে হয় নাহলে সিদ্ধিলাভ হবে কেন? গণেশ ঠাকুর হলেন সিদ্ধিদাতা। মাটির গণেশ থাকেন কাঠামোতে চুপ করে, কিন্তু জীবন্ত সিদ্ধিদাতারা চুপ করে থাকেন না। একটি হাত বাড়িয়েই থাকেন।

তা দুষ্ট লোকে যাই বলুক, বিনে পয়সায় জমাদারিই পাওয়া যায় না, তাতে কিনা জমিদারি! আর সে জমিদারি কিনা নাটোরের মত মহালের।

শোর সাহেব দিন গণেন, আর ফুর্তিতে মশগুল হয়ে পা নাচান। এই নেটিভ জমিদারের হাঁড়ির খবর জানা হয়ে গেছে। দান করে

আর লোককে খাইয়েই ফতুর। ভাড়ে তেল নাই এখন প্রদীপ জ্বলবে কি করে? দান করা, লোক-খাওয়ান অবশ্য ভাল কথা, কিন্তু নিজের ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা স্বার্থ টি বজায় রেখে। সাহেব লক্ষ্য করেছেন নেটিভেরা একথা বোঝে না। অবশ্য সবাই নয়, বেশির ভাগ। নেটিভদের মধ্যেও বিজ্ঞলোক আছে। স্বার্থ সম্বন্ধে যাদের জ্ঞানটুকু বেশ টনটনে তারা যাকে বলে প্র্যাকটিকেল ম্যান। বেশির ভাগ লোকই এমন অজ্ঞ যে দিতে দিতে সব ফুঁকে বসে থাকে।

নেটিভদের কাণ্ড দেখে শোর সাহেব মনে মনে হাসেন।

নাটোরের জমিদারি ক'টুকুরো হবে, কে কে পত্তন নেবে, বাটোয়ারা প্রায় ঠিক। কোম্পানির নেকনজরে আঙুল ফুলে কলাগাছ তো কম লোক হয়নি। অনেকেই টাকায় চকমকি ছুটায়। কান্ত পেল কাশিমবাজারের জমিদারি।—মহারাজা অফ কাশিম বাজার! ষাট টাকা মাইনের মুন্সি নবকৃষ্ণ হলেন মহারাজ নবকৃষ্ণ। রতন সরকার মাথায় করে বাড়ী বাড়ী থেকে কাপড় নিয়ে নদীর ঘাটে কাপড় কাচে। কুল্লে তিনটি ইংরাজি শব্দ জানে ইয়েস, নো, ভেরি গুড। এরই জোরে কোম্পানির নেকনজরে পড়ে দেখ এখন কলকাতার দশমুণ্ডের এক মুণ্ড। এমনি কত মাণিক, হীরে, মোতি, জহরৎ কলকাতায় ছড়িয়ে আছে। জমিদারি কেনবার লোকের অভাব?

সাহেব স্বপ্ন দেখেন দেশে ফিরে লর্ডদের মত দিন কাটাতে পারা যাবে। পকেটে কিছু জমা পড়েছে। এই জমিদারি পত্তন দিয়ে জমার ঘরটা আরো বাড়িয়ে নেয়া যাবে।

ইণ্ডিয়া হচ্ছে সোনার দেশ। এখান থেকে সোনা দানায় পকেট ভরে না নিয়ে গেলে দেশে কি আর কেউ পাত্তা দেবে, না মান থাকবে? যে গাছটি ডালে ডালে পাকা ফলে লুটিয়ে আছে, সে গাছের নীচে থেকে কি কেউ আর শূন্য পকেটে ফিরে আসে?

শোরের কল্পনা দিন দিন বেড়েই চলে। তখন ইংরাজেরা নিজেদের দেশকে হোম বলত। আর এদেশকে মনে করত বিদেশ। এসেছিল একজন সামান্য সৈনিক হয়ে। কোম্পানির নেকনজরে পড়ে শোর সাহেবের অনেক উন্নতি হয়েছে। শোর এখন কোম্পানির একজন হোমরা-চোমরা লোক।

সাহেবের মনে পড়ে হোমের কথা। বাপ যুদ্ধে মারা গেছে, আছে বিমাতা। হোমে থাকতে সাহেব ভালবেসেছিল একটি মেয়েকে। মেয়েটি চাকরি করত একটা হোটেলে। মজুরী পেত খুব সামান্য। হোটেলের নিয়ম ছিল চাকর-বাকরদের রোজকার মজুরী রোজ দেওয়া। এতে অল্প মজুরীর চাকর-বাকরদের সুবিধাই হত।

শোরের ইচ্ছা ছিল মেয়েটিকে বিয়ে করে। কিন্তু শোরের অবস্থাও ছিল মেয়েটিরই মতন। নিজের দেশে থাকলে অবস্থার পরিবর্তন হবে না জেনে শোর ইণ্ডিয়ায় আসবার জন্য কোম্পানির সৈন্য দলে যোগ দেয়।

প্রথম প্রথম তাকে জলের ওপর জাহাজে জাহাজে থাকতে হত। ডাঙ্গায় নামতে পেত খুব কম। শোরের ইচ্ছা ছিল একবার ইণ্ডিয়ার ভেতরে যেতে পারলে হয়। দেশটাকে একবার দেখা দরকার।

শোর সাহেবের সাহস ছিল। এই সাহসের জোরে শোর কোম্পানির নজরে পড়ে।

না, এবার সে বিয়ে করবে। সেই মেয়েটিকে। হয়ত সে অপেক্ষা করছে শোরের জন্য। সাহেব মনে মনে হাসে আর ঘন ঘন হাই তোলে। মাঝে মাঝে তো শোর দেশে চিঠি পাঠায়। তার পদমর্যাদার কথাও কয়েকবার লিখেছে। এই সব শুনে মেয়েটি না এসে পড়ে ইণ্ডিয়ায়। আসে তো আর কি হবে? তবে সাহেবের ইচ্ছে নয় বিয়ে-করা বৌকে নেটিভদের দেশে রাখা।

সাহেবের আরও অনেক সাধ ছিল। ইণ্ডিয়ায় এমন অনেক জিনিস আছে যা তার নিজের দেশে নেই। এখান থেকে এই সব জিনিস চালান দিতে পারলে বেশ দু'পয়সা পাওয়া যায়। তবে কোম্প্যানির নজরে না পড়ে তাহলে তার পদমর্যাদা আর চাকরি দুই যাবে।

মনের খুশিতে শোর সাহেব কলিগটের (কালীঘাটের) গডেসের কাছে একটা বেশ বড় রকম পূজা পাঠাবার ঠিক করে ফেললেন।

নেটিভদের এই গডেসের উপর শোর সাহেবের বড় ভক্তি। নেটিভদের এই নেকেড গডেস বড়া স্পিরিটেড আছে। পূজোটুজো পাঠালে খুশি হন। ফলও পাওয়া যায়।

শুধু শোর কেন, তখন ইংরাজেরা ভীড় করে পূজো দিত কালী-ঘাটের মন্দিরে। ক্লাইভ সাহেবও নাকি পলাশী যাবার আগে পূজো পাঠিয়ে ছিলেন কালিঘাটে।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু এই গডেসই বাদ সাধলেন।

একদিন স্বপ্ন দেখে রাত্রে ঘুমের ঘোরে সাহেব চেঁচিয়ে উঠলেন, ওঃ! নো নো।—উঠে বসে সাহেব শুধু চোখ মোছেন আর বলেন, ওঃ। হরিবল! একগা ঘেমে সাহেব হাসফাঁস করেন আর চার পাশ তাকান। গডেস যদি স্বপ্ন ছেড়ে প্রকাশ্যেই এবার তাড়া করেন! এখনও পরিষ্কার কানে বাজছে, রাণীর এক টুকরো জমি যদি কাউকে দিস তবে এই খড়্গ দিয়ে তোকে কেটে ফেলব।

শোর সাহেব কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে আবার ঘুমোবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু আবার ঘুম ভেঙ্গে গেল। মহাভয়ঙ্করী উগ্রচণ্ডী রক্ত-মাখা খড়্গ নাচিয়ে আবার সাবধান করে দিলেন।

সাহেব বাকী রাতটুকু বসে কাটালেন।

দিনের আলোয় শোর সাহেব ফিরে পেলেন সাহস! লজ্জিত

হলেন রাত্রির কথা ভেবে। ছিঃ ছিঃ স্বপ্ন দেখে এত ভয়। মেয়েরা শুনলে হাসবে।

দিনের সাহস আবার রাতে ঘুমের মধ্যে বেমালুম সরে পড়ে। সেই একই স্বপ্ন দেখেন শোর সাহেব। একরাত নয় পরপর তিন রাত সেই একই বিভীষিকা। শোর সাহেব জেগে বসে থাকেন। রাতের ঘুম সাহেবের মাথায় উঠেছে।

এবার শোর সত্যিই খুব ভয় পেলেন। রাতের ভয় দিনেও সাহেবকে ছাড়ে না। বসে থেকে থেকে হঠাৎ চমকে ওঠেন। ঐ বুঝি এলো! বলা যায় না, নেটিভদেরই যখন বিশ্বাস করা যায় না, তখন তাদের গডেসের উপরই বা ভরসা কি?

দিনের বেলায় তবুও এক রকম কেটে যায়। কিন্তু রাত হলেই সাহেব চমকে ওঠেন। রাণীকে চিঠি দিলেন সাহেব। নিজে থেকেই যথেষ্ট সময় দিয়ে লিখলেন আপনাকে আমি সময় দিচ্ছি! অনুগ্রহ করে জানাবেন কবে পর্যন্ত আপনি টাকা পাঠাতে পারবেন। আমি অপেক্ষা করব। কোন অসুবিধা হলে অনুগ্রহ করে আমাকে জানাবেন আমি আপনাদের একজন শুভানুধ্যায়ী।

সাধে কি আর বাবা বলি, গুঁতোর চোটে বাবা বলায়! দুঁদে শোর সাহেব, কড়া শোর সাহেব, জমিদার ত্রাস শোর সাহেব একদম জল! নাটোর অনুগ্রহ করে টাকা পাঠালে কৃতার্থ হয়ে যাবে এমনি ভাব।

সাহেবের চিঠি পেয়ে নাটোর সরকার অবাক! একি চিঠি? ইংরাজ রসিকতা জানে না। গোমড়া মুখে বুঝি রস নাই। যদিও থাকে তবে সে হচ্ছে ইংরাজে ইংরাজে। তাহলে এ চিঠি কেন? এরকম চিঠি কেন? এমন কি অঘটন ঘটে গেল!

ভবানী অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়ে সাহেবকে নিমন্ত্রণ করলেন

চিঠি পাঠাবার পর থেকেই সাহেব আর বিভীষিকা দেখেন না। রাণীর নিমন্ত্রণ চিঠি পেয়ে ভাবলেন, কি করা উচিত? সাত পাঁচ ভেবে ঠিক করলেন, যাওয়াই ভাল। কি জানি জমিদারির নাম নিতেই যে কাণ্ড, প্রত্যাখ্যান করলে হয়ত আর ঘুমটুম নয়, গডেস হয়ত দিনের বেলায়ই খাঁড়া নিয়ে তাড়া করে আসবেন! ইণ্ডিয়া শুধু সোনার দেশ নয়, ইণ্ডিয়া মিরাকেলের দেশ, ইয়োগীর (যোগীর) দেশ। এখানে খুব সমঝে না থাকলে কি থেকে কি হয়ে যাবে সে কথা স্বয়ং যীসাস্ও বলতে পারেন না। সাহেব নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

ঘোড়া দাবড়িয়ে, তরোয়াল ঝুলিয়ে আরদালি সঙ্গে করে সাহেব গেলেন নিমন্ত্রণ রাখতে। মাঝে মাঝে বুক দুর দুর করে ওঠে, সেই গডেসের মত নয়ত রাণী? ইণ্ডিয়ার এসব জেণ্টু লেডিদের কখন দেখে নি। শুনেছে দরকার হলে এরা নাকি হাতিয়ার ধরে লড়াইও করে। গডেসের হাতে খড়গ দেখে কথাটা সাহেবের বিশ্বাস হয়েছে।

কিন্তু দেখে শুনে সাহেব খুশি হলেন।

নাটোরেশ্বরীর মন্দির দেখলেন, ঘুরে ঘুরে রাজবাড়ী দেখলেন, কাঁচাগোল্লা খেলেন, রাণীর সাক্ষাৎ পেলেন।

রাণীকে দেখে সাহেব মাথার টুপি নামিয়ে বলে উঠলেন—ওঃ আই সি, সি ইজ মাদার মেরী! জেণ্টু লেডিরা খুব মাদারলি!

শোর সাহেব খুশি হয়ে ফিরে গেলেন। ভবানীর সাক্ষাৎ পেয়ে ভয় দূর হয়েছে। মন ভরেছে শ্রদ্ধায়।

শোর রাণীর স্বপক্ষে রিপোর্ট পাঠালেন উপরে।

সময় পেয়ে রাণী কোম্পানির বাকী-বকেয়া শোধ করে দিলেন।

—এগার—

বয়স হয়েছে রাণীর। ষাঠের কোঠা পার হয়ে সত্তর ধর ধর। এখন মন একটু মাঝে মাঝে নিরালা বিশ্রাম চায়।

পরপারের মাশুল যোগাড় করা চাই তো? আর কতকাল ঘানিগাছে ঘুরে বেড়াবেন? কিন্তু পারের কড়ি কার দরকার? তোমার আমার। যার জমার ঘরে শূন্য তার। সর্ব জীবে যার দয়া, জীবরূপে যে জন পূজিছে ঈশ্বর তার আবার কি। মানুষ পশু পাখি কীট পতঙ্গ—রাণীর দয়া সবার উপরে। জীবই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই জীব। রাণী সারা জীবন জীবব্রহ্মের সেবা করেছেন।

কর্মচারীরা এসে হাত জোড় করে দাঁড়ায়।

—মা, আমরা কি মাতৃহারা হব?

প্রজারা এসে রাজপুরীর চারদিকে জমা হয়।

—মা, শ্রীচরণে আমরা কি অপরাধ করেছি?

ভবানী বলেন,—বাবা বয়স তো হলো। যাবার ডাক এলো বলে।

খোদার মারের উপরে হাত নাই। প্রতিবাদ করে প্রজারা, প্রতিবাদ করে কর্মচারীরা। কিন্তু যতদিন আছেন ততদিন আমরা আমাদের মাকে ছেড়ে থাকব কি করে?

এ মুখের দাবী নয় বুকের দাবী। মুখের দাবীর তোড় থাকে জোর থাকে না। বুকের দাবীর জোর থাকে তোড় থাকে না। তোড় কাটান যায়, জোর কাটে না। আরো জড়িয়ে ধরে।

রাণী হেসে বলেন,—আচ্ছা বাছা।

কর্মচারীরা নিশ্চিন্ত হয়। প্রজারা খুশি হয়।

ঝড়-ঝাপটা আসে কিছু কিছু। আগের অনেক ঝড়-ঝাপটা ভবানী সহ্য করেছেন। এখনও তা সহ্য করে যাচ্ছেন। কর্মচারীরা সবাই বিশ্বাসী। অশান্তির কিছু দেখলেই তারা রাণীকে জানায়। রাণীর পরামর্শে কর্মচারীরা সে সব অশান্তি দূর করতে চেষ্টা করে। ভবানীর বয়স হয়েছে ঠিকই তবু তিনি সবদিকে লক্ষ্য রাখেন।

অতিথিশালায় অতিথির সেবা হচ্ছে কি না। দেববিগ্রহের পূজা অর্চনা হচ্ছে কিনা রাণী নিজেই এই সব দেখতেন। কর্মচারীদের মুখের সংবাদ শুনে তিনি চলতেন না। এছাড়া রাণীর সঙ্গে কেউ দেখা করতে এলে তিনি তখনই তা মঞ্জুর করতেন। নানা কাজের মধ্যে থাকলেও তিনি সাক্ষাৎপ্রার্থীকে দেখা করবার অনুমতি দিতেন।

সংসারে সৎ অসৎ দু'রকম লোকই আছে। রাণীর কাছে অসৎ লোকও যে প্রার্থী হয়ে আসে না তা নয়। তিনি সৎ অসৎ বিচার না করেই প্রার্থীর আবেদন মঞ্জুর করেন। শেষে জানতে পারলে তিনি চুপ করেই থাকতেন। এরজন্য কাউকে দোষারোপ করতেন না।

রাণীর জীবনে দু'একটা এরকম ঘটনা ঘটেও গেছে। একবার এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এল রাজবাড়ীতে। সময়টা ছিল মধ্যাহ্ন। ব্রাহ্মণ দেউড়ীর প্রহরীকে বলল যে সে রাণীমার সঙ্গে দেখা করবে। তার একটি জরুরী আবেদন আছে রাণীমার কাছে।

ব্রাহ্মণকে যেতে না দিয়ে প্রহরী বলল, মা এ-সময় বিশ্রাম করেন। তাঁর সঙ্গে দেখা হতে পারে অপরাহ্নকালে।

বাধ্য হয়ে ব্রাহ্মণকে অপেক্ষা করতে হল অপরাহ্ন পর্যন্ত। রাণীর কাছে সংবাদ গেল একজন ব্রাহ্মণ সাক্ষাৎপ্রার্থী। পরে তিনি ব্রাহ্মণের মুখে শুনলেন যে দেউড়ীর প্রহরী তাকে রাণীর সঙ্গে

দেখা করতে দেয়নি। তখনই ডেকে পাঠালেন প্রহরীকে। প্রহরীটি সেদিনই বদলি কাজে ভর্তি হয়েছিল। রাণীর যে আদেশ ছিল তা সে জানত না।

এই ব্রাহ্মণ ছিল অসৎ প্রকৃতির লোক। তার আসল উদ্দেশ্য ছিল রাণীর কাছ থেকে কিছু টাকা আদায় করা সত্য মিথ্যে কিছু বলে। ব্রাহ্মণ বলল, কোম্পানির লোক তার ছেলেকে ধরে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখেছে। অনেক আবেদন করেও সে ছেলেকে ছাড়াতে পারছে না।

রাণী জানতে চাইলেন ছেলের অপরাধ কি ?

ব্রাহ্মণ বলল, অপরাধ কিছুই নয়। সন্দেহ করে তারা আমার ছেলেকে ধরেছে ! কোম্পানি তো এখন যাকে সন্দেহ করছে তাকেই আটকে রাখছে। পাঁচ হাজর টাকা পেলে কোম্পানি আমার ছেলেকে ছাড়বে এ খবর আমি পেয়েছি।

গরীব ব্রাহ্মণ আমি! কোথায় পাব অত টাকা! একসঙ্গে একশো টাকা কখনো চোখে দেখিনি। ঐ আমার একমাত্র ছেলে। ঘরে আছে বৌমা আর শিশু পৌত্র। শুনতে পাই কোম্পানির লেকেরা যাদের আটক করে, পরে তাদের গুম করে দেয়।

কোন উপায় না দেখে তোমার কাছে এসেছি মা! আমার ছেলেকে রক্ষা করতে হবে।

রাণীও জানতেন যে এসময় দেশে অরাজকতা চলছে। নবাবকে কেউ মানে না। কোম্পানির হুকুমেই সব চলছে। কোম্পানিই দেশের রাজা হতে চলেছে।

ব্রাহ্মণকে ভাল করে দেখলেন রাণী। শুষ্ক চেহারা, জীর্ণ বেশ। দেখে দয়াও হল রাণীর। অন্য সময় হলে খোঁজ খবর নিয়ে তবে তিনি প্রার্থীর প্রার্থনা মঞ্জুর করতেন। ব্রাহ্মণের ছেলের দুর্দশা শুনে নিজের ছেলে রামকৃষ্ণের কথা মনে পড়ল।

রাণীর মনে এল দুর্বলতা। তিনি ব্রাহ্মণকে পাঁচ হাজার টাকা দিতে আদেশ করলেন।

টাকা নিয়ে ব্রাহ্মণ রাজবাড়ী ছেড়ে চলে গেল।

কয়েকদিন পরে রাণী ব্রাহ্মণের চাতুরির কথা জানতে পারলেন। ঐ ব্রাহ্মণ ছিল কোম্পানির অধীনস্থ একজন গোমস্তা। অনেক টাকা আত্মসাৎ করে সে সরে পড়েছে।

কোম্পানির লোক তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

কোম্পানি খবর পেয়েছে যে ব্রাহ্মণ রাণীর আশ্রয়েই আছে। কোম্পানির লোক এল রাণীর কাছে সংবাদটি সত্য কি না জানতে। ব্রাহ্মণ ধরা পড়ে গেল কোম্পানির লোকের হাতে। রাণীর কাছে খবর এল। রাণী ভুলে গেলেন ব্রাহ্মণের চাতুরির কথা। ব্রাহ্মণের বিপদকে তিনি বড় করে দেখলেন। কোম্পানিকে লিখে পাঠালেন কত টাকা পাঠালে তারা ব্রাহ্মণকে মুক্তি দেবে।

এই রকম ছিলেন রাণী ভবানী। তিনি লোকের বিপদকে বড় করে দেখতেন। নিজে যে ঠকছেন সেদিকে নজর দিতেন না।

আরো কয়টা বছর কেটে গেছে।

ভবানী তখন থাকেন বড়নগরে। গঙ্গাতীরে থাকেন। মহলের গা ছুঁয়ে গঙ্গা বয়ে যায়। রাণী আছেন আর আছে তারাসুন্দরী। কপালপোড়া মেয়ে তারাসুন্দরী। বাঁধবার মুখে ঘরটি যার ঝড়ে উড়ে গেল!

মাঝে মাঝে প্রজা পাইক এসে প্রণাম করে। কর্মচারী আসে পরামর্শ নিতে। প্রার্থীরা আসে প্রার্থনা নিয়ে। ভবানী চিরকূট লিখে দেন প্রার্থীর হাতে। সেরেস্তায় গেলেই ব্যবস্থা হয়।

'তারাসুন্দরীকে রাণী আগলে রাখেন। তারার ভুবনমোহিনী

রূপ অন্য লোকের চোখে না পড়ে। একে বিধবা তার ওপর সুন্দরী তাই রাণী তাকে নিয়ে একটু সশঙ্কিত থাকেন বৈকি।

মা হয়ে চোখের সামনে নিজের মেয়ের বৈধব্যদশা দেখা কত কষ্টকর! ভবানী তারার কথা যত ভাবেন ততই তাঁর মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। তাঁর অবর্ত্তমানে তারার কি দশা হবে? ভেবে আর করবেন কি? ঈশ্বর যার সব কেড়ে নিয়েছে তার বাঁচবার পথ আর কোথায়?

এ সময় এক ঘটনা ঘটল। একদিন তারাসুন্দরী তাদের মহলের ছাদের ওপর উঠে আলসেয় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এমন সময় সিরাজদ্দৌলা তার ইয়ার-বক্সীদের নিয়ে নৌকা করে গঙ্গার ওপর দিয়ে যাচ্ছিল। তারার মোহিনী মূর্তি নবাবের চোখে পড়ল। নাবব জেনেও নিল মেয়েটি কে। অমনি নৌকা ফেরাবার আদেশ হল।

বাতাসে উড়ে এল খবর রাণীর কাছে। রাণী প্রমাদ গণলেন। তখনই তিনি তারাকে নিয়ে বড়নগর ছেড়ে নাটোরে চলে এলেন।

এই ঘটনার পরে রাণী মনে খুব ব্যথা পান। তাঁর দেহ ভেঙ্গে পড়ে।

বিপদ কখন কি ভাবে আসবে মানুষ তা জানে না। আগে জানতে পারলে মানুষ খানিকটা সাবধান হতে পারে।

সময়মত বড়নগর থেকে চলে না এলে তারার যে কি বিপদ হত তা তিনি কল্পনা করতে পারেন না। তাই, মৃত্যুর শেষদিন পর্যন্ত রাণীর মনে এই বিপদের কথা জাগরুক ছিল।

দিন চলে ভবানীর এক তালে।

কিন্তু মন চলে না। দিন শুধু এগিয়েই যায়, পিছু তাকায় না।

মন কিন্তু মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়ায়, ফেলে আসা দিনগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখে। দিন চলে একভাবে সামনের দিকে মন চলে আগু পিছু।

নিরালা অবসরে বসলে মাঝে মাঝে ভবানীর মন পিছন ফিরে তাকায়। সব ঘুরে যেখানে এসে থমকে দাঁড়ায়, বুঝি একটু কেঁপেও ওঠে, সে ছবিটি বড় ভীষণ। ক্ষমা নাই তার। ভবানী ক্ষমা করতে পারেননি, কেউ পারেনি, তুমি আমি কেউ না।

যার কেউ নেই তার আছেন পৃথিবীতে মা ভবানী আর মাথার উপরে ভগবান। গরীব গুরবোর আশা নাটোরের রাণী। মনটি ফুলের মত নরম তা বলে মনে করো না সামান্য আঘাতেই পাপড়ি খসে পড়বে।

নরম বটে ফুলের মত আবার শক্ত হলে জমাট বাধা ইস্পাত। তাই কর্ম্মচারীরা যেমন ভয় করে ভক্তিও করে তেমন।

রাণীর পাইক প্রজারা নমঃশূদ্র। কাছেই থাকে। মাথায় বাবরি, হাতে বালা, সিঁন্দুরে চোখ, হাতের লাঠি মাথার উপরে দু'হাত—রংটি তাদের নিকষ কালো, গুলিভাঁটার মত দেহের গড়ন। গোলগাল গ্যাঁট্টা-গট্টা। চলন বলন এমনিতে সাদাসিধে। কিন্তু তাকায় যেন বাঘের চোখে। লাঠি হাতে রুখে দাঁড়ালে মরদের হাতের ঢাল তরোয়াল ঝনঝনিয়ে খসে পড়ে। সাহেব সুবোর হাতের বন্দুক কাঁপে। জানের পরোয়া করে না। মনিবের মানের পরোয়া করে। মনিবের হুকুমে জান দিতেও পারে নিতেও পারে। সেই পাইকেরা আছে রাণীর সঙ্গে। বিদেশ বিভূঁয়ে রাণীমার ছায়া হয়ে ফেরে পাইক সর্দার দুলে বাগ্‌দী। যার লাঠির ডাক শুনে দুষমণ কাঁপে। দুলের লাঠি রক্ত না খেয়ে ফেরে না।

রাণী ফিরছেন রামায়ণ গান শুনে। দশাশ্বমেধ ঘাটের রামায়ণ গান সেদিন কয়ের দণ্ড বেশি হয়েছে। মন্দিরের আরতি হয়ে

গেছে, ভক্তরা চলে গেছে। রাহী পথিকেরা আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে। বণিক ব্যবসাদারের ঝাপ পড়েছে—লোক কম পথের বুকে।

ভবানী ফিরছেন, সঙ্গে আছে দাসী আর দুলে সর্দার। ভবানী চলেছেন নির্ভয়ে। আহির মহল্লার পাশদিয়ে রাস্তাটি বাঁক নিয়েছে। থমকে দাঁড়ালেন ভবানী। ভাং চড়িয়ে আহিরেরা রাস্তায় বসে হল্লা করছে। পথ নাই! সন্ধ্যার পরে কেউ যায় না এপথে। দিনের আহির রাতে হয় ডাকাত। শুধুই টাকা পয়সা গয়না অলঙ্কার নয় মেয়ে পেলে আরো মেতে ওঠে আহির ডাকাতরা। ডাকাতি করে তার সর্বস্ব।

আহিরেরা শিকার পেয়ে হল্লা করে উঠল।

বাগ্দী সর্দার দুলে বুক চিতিয়ে দাঁড়াল সামনে।

রাণীমা হুকুম!

রাণীর অপমান সহ্য করে না নাটোরের পাইক।

রাণীর মাথার আঁচল খসে পড়েছে, ভবানী হলেন রুদ্রাণী। মুখের রক্ত বুঝি জমা হলো চোখে। কোমল মুখে লেগেছে আগুনের ছোঁয়া।

ভবানী দাঁড়াল সামনে।

সেদিকে তাকিয়ে আহিরদের চমক লাগল।

তারা জানে শিকার ভয় পেয়ে কাঁদে, পায়ে ধরে, ধর্মের বাপ, ভাই ডাকে কিন্তু এমন কখন দেখিনি।

—কি চাও?

কি হলো আহিরদের কে জানে! সেলাম করে বলল, মাতাজী আপনারা চলে যান। কিন্তু আমাদের মহল্লার বুকের উপর দিয়ে যে লাঠি হাতে করে যায় তাকে আমরা ছাড়ব না।

—কেন?

আমাদের গোটা মহল্লার বদনাম হবে। সবাই বলবে আহির মহল্লায় মরদ নাই। আপলোক যাইয়ে লেকিন উসকো—

আহিরেরা পাইকের দিকে আঙ্গুল দেখাল।

পূর্ব পুরুষের ডাকাত-রক্ত ভুলের গায়ে টগবগ করে উঠল।

—মা সরে দাঁড়ান।

মুখের কথা তো নয় যেন জালার আওয়াজ। রাণী তাঁর পাইকের এ গলা চেনেন। জানেন এ কথার অর্থ কি। সরে দাঁড়ালে পাইকের গলা দিয়ে যে শব্দটি বের হবে সে বড় মারাত্মক। বাঘের গর্জনও এত হিংস্র নয়।

আহিরদের দিকে তাকালেন ভবানী। লম্বা চওড়া দেহগুলি অসুরের মত শক্তিমান। হাতের লাঠিগুলির গাঁটে গাঁটে লোহার মোড়। নেশার সঙ্গে হিংসা মিশে ধিকি ধিকি জ্বলছে চোখের তারা। জমা হয়েছে গোটা আহির মহল্লা।

ভবানীর বাগদী পাইক দাঁড়িয়ে আছে সে দিকে তাকিয়ে, লাফিয়ে পড়ার আগে বাঘের মত।

আমার লোকের গায়ে হাত দিলে আমি তোমাদের ক্ষমা করব না। ভবানী বললেন, আহিরটোলায় একটি ঘরও দাঁড়িয়ে থাকবে না।

আহিরেরা ক্ষেপে গেল।

পথচারি পথিকেরা কেউ কেউ দাঁড়িয়ে ছিল। রাণী সেদিকে তাকিয়ে বললেন, আমি নাটোরের রাণী ভবানী। তোমাদের মধ্যে কেউ গিয়ে আমার পাইকদের খবর দিয়ে এসো, তাদের রাণীকে আহিরেরা অপমান করেছে।

দর্শকদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল।

—ভুলে! রাণীর কণ্ঠে বজ্রের কঠোরতা।

এই একটি কথাই যথেষ্ট। রাণীর ইঙ্গিত বুঝল পাইক।

—আজ আমি নিজে দাঁড়িয়ে তোর কব্জির জোর দেখব।

রাণীর কথা শেষ না হতেই চমকে উঠল পথিকেরা, চমকে উঠল আহিরেরা, চমক লাগল আহির মহল্লার বাতাসে।

ভুলের কণ্ঠে জাগল রণহুঙ্কার বাংলার সেই হারে-রে-রে-রে। সে ডাক শুনে আকাশের পাখি পর্যন্ত অচেতন হয়ে পড়ে।

চোখের পলকে ঝড় বয়ে গেল আহিরদের দলে। ভুলের লাঠি চলেছে চতুরঙ্গ চালে। আরো পিছে, ডাইনে, বাঁয়ে লাঠি পড়ছে ঘুরে ঘুরে। গায়ে জেগেছে খঞ্জনের গতি। বিদ্যুতের মত ভুলের নিকষ কালো দেহটি চমকে চমকে যাচ্ছে চোখের উপরে। আহিরের লাঠি ওঠে শূন্যে বাতাস কেটে ফিরে আসে। ভুলের লাঠি পড়ে আহিরদের মাথায়, কব্জিতে, দেহে।

ভবানী তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন সেদিকে। দু'চোখে জ্বলছে আগুন। লাল হয়ে গেছে পাইকের দেহ, লাল হয়েছে আহিরেরা, লাল হয়েছে পথের ধুলো শব্দ উঠছে ঠক ঠক।

আহিরদের চোখের ভাষা বদলাচ্ছে। তাচ্ছিল্য আর ক্রোধের স্থান নিয়েছে ভয় ও বিস্ময়। ভুলের চোখে বাড়ছে আগুনের মাত্রা।

রাণীর পাইকেরা খবর পেয়ে ছুটে এলো।

—জয় মা ভবানী—

লাঠির গুঁতোয় নেশা ছুটেছে আহিরদের।

মহল্লার মোড়ল ছুটে এলো জোড় হাতে। বসে পড়ল বৃদ্ধ মোড়ল ভবানীর পায়ের কাছে।

—মাপ কিজিয়ে রাণীমা!—এ হতভাগারা একদিন এমনি করেই জাহান্নামে যাবে। খুব শিক্ষা হয়েছে আহিরদের।

জোয়ান জোয়ান আহিরেরা ধুলোয় পড়ে আছে। পাইকের কালো রংয়ে বইছে রক্তের ঢেউ। একবার সেদিকে তাকালেন ভবনী।

ফিরিয়ে নিলেন পাইকদের।

রাতে আবার এলো পাইকেরা আহির মহল্লায়। দণ্ডপানি হয়ে শত্রুবেশে নয়। কাঁধে করে বয়ে এনেছে ওষুধ, পথ্য আর খাদ্য'

মা অবাধ্য ছেলেকে শাসন করে। দরকার হলে নির্মম কঠোর শাসনও করেন। কিন্তু যে হাত দিয়ে শাসন করেন সে হাতই আবার গায়ে বুলিয়ে দিয়ে আঘাতের ব্যথা ভুলিয়ে দেন, না হলে আর মা কি! অবাধ্য ছেলেকে মা প্রহারও করেন আবার আদরও করেন।

রাতের বুক চিরে আহির মহল্লায় জয়ধ্বনি উঠল, জয় ভবানী মাঈকি জয়—জয় রাণীমাঈকি জয়।

মা! সরকার এসে দাঁড়াল। একজন প্রার্থী—

—নিয়ে এসো।

সরকার প্রার্থীকে নিয়ে এলো।

—মা! মাতৃদায়—

ভবানীর মুখে মৃদু হাসি। চোখের দৃষ্টিতে অলক্ষ্যে একবার তীক্ষ্ণ চমক খেলে গেল।

প্রার্থী দাঁড়িয়ে আছে জোড় হাতে। গলার ধড়ায় ঝুলছে একটি লোহার চাবি।

বগলে কুশাসন। রুক্ষ মাথার চুলে কিছু কিছু জট পড়েছে।

ভবানী বললেন, আপনি—

—ব্রাহ্মণ মা! গলার পৈতে দেখিয়ে ব্রাহ্মণ বলল। শুনেছি যার কেউ নাই তার মা ভবানী আছেন। তাই মা আপনার কাছে এসেছি।

—দেশ কোথায় ছিল?

—বর্দ্ধমান।

আচ্ছা যান। ভবানী সরকারকে নির্দেশ দিয়ে প্রার্থীকে যেতে বললেন।

খাজাঞ্চি ভবানীর নির্দেশ-নামার দিকে তাকিয়ে মুখ তুলে

তাকাল ব্রাহ্মণের দিকে। তারপর এক দৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখল।

ব্রাহ্মণ নির্বিকার মুখে বসে আছে।

—কই, আমাকে একটু তাড়াতাড়ি বিদায় করুন। খাজাঞ্চিকে তাড়া দিয়ে ব্রাহ্মণ বলল, কতক্ষণ বসিয়ে রাখবেন।

খাজাঞ্চি উঠে দাঁড়াল।

আপনি একটু বসুন, আমি আসছি।

ব্রাহ্মণ বিড় বিড় করে উঠল।

—বসুন।—কেন আমাকে দিয়ে গেলে কি হতো।

খাজাঞ্চি পাইকের কানে চুপি চুপি বলে গেল, ব্রাহ্মণ যেন পালাতে না পারে।

ভবানী বসেছিলেন।

খাজাঞ্চি এসে ডাকল মা, —

ভবানী মুখ তুলে তাকালেন।

খাজাঞ্চি ভবানীর লেখা আদেশপত্রটি দেখিয়ে কুণ্ঠিতভাবে মৃদুস্বরে বলল—মা! এ টাকাটা দেবার আগে একটু বলবার ছিল যে—

ভবানী মৃদু হেসে বললেন,—জানি।

খাজাঞ্চি একটু অবাক হয়ে তাকাল।

—তা'হলে—

—হাঁ, তা'হলেও দিয়ে দিন। আমি ব্রাহ্মণকে চিনি। আমাদের ছাতিনা গাঁয়ে ওর বাড়ি।

—গত মাসে ও মাতৃদায় বলে সাহায্য নিয়ে গেছে—প্রতিমাসেই মাতৃদায়ের সাহায্যের জন্য ঘুরে বেড়াবে।

ভবানী হেসে বললেন,—মাতৃদায়ই ওর পেশা খাজাঞ্চি মশাই।

বলতে বলতে ভবানীর চোখ দুটি করুণ হয়ে উঠল।

খাজাঞ্চি মশাই। যে মানুষ মাতৃদায়কে পেশা করে দিন চালায়, তার দায় কত বড় ভেবে দেখুন। এ ছলনাটুকু না করলে হয়ত ওর স্ত্রী-পুত্র উপোসী থাকবে। মানুষ কখন মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে অভিনয় করে দিন চালায় খাজাঞ্চি মশাই? যখন তার কোন উপায় থাকে না। অভাবে মানুষ মানুষ থাকে না। আপনি ওকে দিয়ে দিন,—আর বলে দিন যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন নাটোর সরকার থেকে মাসিক বৃত্তি পাবে। আমি যে এসব কথা জানি, ওকে বলবেন না, লজ্জা পাবে—আচ্ছা আসুন।

খাজাঞ্চি নমস্কার করে বেরিয়ে এলো।

অভিভূত খাজাঞ্চি যেন এখনও নিজের চোখ-কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। কার কাছে গিয়েছিল! এযে স্বয়ং অন্নপূর্ণা। দীন, দুঃখী, পাপী-তাপী সবার জন্যই যে অন্ন সাজিয়ে রেখেছেন। সূর্যের আলো যেমন পাত্রভেদে রশ্মি বিকিরণ করে না, নদীর জল যেমন সবার তৃষ্ণাই মিটিয়ে দেয়, ভবানীর দানের ধারাও তেমনি বয়ে চলে। জাতি-ধর্ম-শত্রু-মিত্র কেউ সেই অকৃপণ দানে বঞ্চিত হয় না। খাজাঞ্চি দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে ক্যাসবাক্স টেনে নিল।

—ঠাকুর মশায়, এই টাকা নিয়ে চিরদিনের মত আপনার মাতৃদায় শেষ করুন। এখন থেকে আপনার যত দায় নাটোর রাজসরকার গ্রহণ করল। প্রতিমাসে এসে আপনি মাসোহারা নিয়ে যাবেন। মৃত পিতা-মাতাকে আর বারবার মারবেন না।

—বাবুমশাই! অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে ব্রাহ্মণ বলল,—আপনার জয় হোক।

খাজাঞ্চি লজ্জিত হয়ে বলল,—না না, আমাকে কিছু বলবেন না। যিনি আমাদের সবার মা, এ তাঁরই আদেশ। মা ভবানীর ব্যবস্থা। আপনার বহু ভাগ্য যে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।—যান, যা বললাম, মনে রাখবেন।

পিছনের অনেক কথা ভবানীর মনে পড়ে। ভবানী তখন কাশী-ধামে আছেন।

দেশের দিকে মন টানছে ভবানীর। নাটোর থেকেও চিঠি এসেছে। প্রজারা তাদের মাকে দেখবার জন্য উতলা হয়েছে।

কাশীবাসাদের চোখ ছলছলিয়ে উঠল।

—মা, আপনি নাকি চলে যাবেন ?

—আমরা কার মুখের দিকে তাকাব মা ?

—আর ফিরে আসবেন না মা ?

ভবানী সবাইকে সান্ত্বনা দেন।

—ভয় করছ কেন ? আমি সব ব্যবস্থা করে রেখে গেলাম। আমার লোক রইল। তারাই তোমাদের দেখবে।

কাউকে বললেন,—শিবধামে, শিব আর অন্নপূর্ণার দিকে তাকাবে মা। আমি মানুষ, তোমাদের আর কতটুকুই বা করতে পেরেছি।

কাউকে সান্ত্বনা দিলেন,—অন্নপূর্ণা টানলে আবার আসব বই কি মা।

আহির মহল্লার আহিরেরা এসে দাঁড়াল।

রাণীমা! আমাদের কসুর মাপ করে যান।

ভবানী হেসে বললেন,—তোমরা ভাল হয়ে চলো বাবা।

দণ্ডী, সন্ন্যাসী, কুমারীরা এসে দাঁড়াল।

ভবানী প্রণাম করলেন।

—বাবা আশীর্বাদ করুন।

মন্দিরের পাণ্ডারা এলেন—

রাণীমা! আবার কবে সাক্ষাৎ হবে ?

অন্ধ, আতুর কেউ বাদ গেল না। সবাই চায় ভবানী মায়ের

দর্শন। মা অন্নপূর্ণা চলে যাচ্ছেন, দর্শন করবে বইকি। দর্শনে যে পুণ্য। মন্দিরের অন্নপূর্ণা মন্দিরে থাকবেন, কিন্তু রক্তমাংসের অন্নপূর্ণার দর্শন রাত পোহালে আর পাওয়া যাবে না।

কাশীতে নাটোরের রাজবাড়ীর দরজায় ভীড় বেড়ে চলে।

ভবানীর বেশ মনে আছে।

এই যেন সেদিনের কথা।

কাশীবাসীদের বললেন, তিনি নাটোরেশ্বরীর আদেশ পেয়েছেন। তাঁকে এখনই দেশে ফিরতে হবে।

লোকজনদের বললেন, গোছগাছ করে নিতে। বজরা সাজান হল। সিপাই বরকন্দাজ সব তৈরী হয়ে থাকল। অতি প্রত্যূষে ভবানী যাত্রা করলেন নাটোর অভিমুখে জলপথে। মাঝি-মাল্লারা জয় মা ভবানী বলে বজরা ছেড়ে দিল।

তখন জলপথ ছাড়া আর কোন পথ ছিল না। এই পথে বহু বিপদের সম্মুখীন হতে হতো। তবুও মানুষকে যেতে হতো এই জলপথেই।

বজরার মাঝি-মাল্লারা ভাবল সোজা পথে গেলে বিপদ হবে বেশি। ঘোর পথে গেলে সময় লাগবে বেশি কিন্তু বিপদের ঝুঁকি কম।

তারা ভবানীকে তাদের মনের কথা বলল।

ভবানী বললেন, না তা হবে না—তোমরা সোজা পথে চল।

নাটোরে পৌঁছাতে তখনও একদিনের পথ বাকী।

ভবানীর আদেশ ছিল সকাল থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত বজরা চলবে। তারপর আহার বিশ্রামের পর বিকাল তিনটা থেকে সন্ধ্যার আগ পর্যন্ত বজরা যতদূর যেতে পারে যাবে। রাত্রিকালে নদীর কিনারে লোকালয়ের কাছে বজরা বাঁধা থাকবে।

সেদিন বিকাল থেকে ঝড়ের বেগ বেড়ে উঠেছে। মাঝি-মাল্লারা

প্রাণপণে বজরা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যা হয় হয় কিন্তু কোন লোকালয়ের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না।

আরও কিছুদূর গেলে বজরার লোকেরা দূরে আলো দেখতে পেল। আলো লক্ষ্য করে তারা এগিয়ে চলল। কাছাকাছি এলে তাদের নজরে পড়ল দু'খানা বড় নৌকা মহাজনা নৌকার মত নদীর একেবারে কিনারা ঘেঁসে রয়েছে। তীরে অনেকগুলো ষণ্ডা-মার্কা লোক দাঁড়িয়ে আছে। কয়েকটা মশাল জ্বলছে।

নৌকার ভেতর থেকে ভেসে আসছে অনেকগুলি নারী-কণ্ঠের চীৎকার। পুরুষ-কণ্ঠের আর্তনাদ আর হায় হায় ধ্বনি।

ভবানীও শুনলেন এই চীৎকার। বজরার সামনে এসে তিনি দাঁড়ালেন। নিশ্চয়ই নৌকার যাত্রীরা ডাকাতের কবলে পড়েছে। বড় বড় নদীপথে তখন ডাকাতরা যাত্রীর যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করত। ভবানী মাল্লাদের বললেন, ঐ নৌকা দুটোর আরো কাছে যেতে।

ভবানীর বজরাখানা দেখে তীরের ষণ্ডা-মার্কা লোকগুলো হৈ-হৈ করে উঠল। শাঁসালো শিকার হাতে পেয়েছে ভেবে তারা বজরার দিকে ছুটে আসতে লাগল।

ভবানী বজ্রকণ্ঠে হাঁকলেন, খবরদার! আর এগিয়েছো কি তোমাদের মাথা থেকে মুণ্ডু খসে পড়বে।

প্রথমটা লোকগুলো হকচকিয়ে গেল। একটা নারীর হুঙ্কারে তারা থামবে! ভবানীর হাঁক গ্রাহ্য না করে তারা এগুতে লাগল! সিপাই বরকন্দাজদের আদেশ করলেন ভবানী ঐ লোকগুলোকে রুখতে।

একটা জোয়ান লোক মনে হয় দলের সর্দার মশাল হাতে বজরার কাছে এল। জোড় হাত করে বলল,—মা, ডাকাতি করা আমাদের পেশা নয়। পেটের জ্বালায় আমরা ডাকাতি করতে এসেছি।

ভবানী জানতেন সময়টা ছিল ছিয়াত্তর মন্বন্তরের কয়েক সাল পারে।

সামনের দুটো নৌকার দিকে হাত তুলে ভবানী বললেন, তোমরা ঐ দুটো নৌকার যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করেছ কিনা?

জোয়ান লোকটি বলল, আমরা শুধু খাবার জিনিস নিয়েছি। টাকা-পয়সা, অলঙ্কার কিছুই নিই-নি। আমাদের পেটে খিদে। খাবার চাই। শস্যদানা চাই। দেশের রাজা চেয়েও দেখে না আমরা মরবো কি বাঁচবো। এতো আর নাটোরের রাণী ভবানীর রাজ্য নয়।

ভবানী বুঝলেন খিদের জ্বালায় লোকগুলো দিশেহারা হয়ে গেছে। ভবানীর বজরার সঙ্গে আর একটি ছোট বজরায় চাল, ডাল, তেল, নুন ইত্যাদি মজুত থাকত। পথে ঘাটে অভুক্ত লোকদের তিনি অন্ন দিতেন।

ভবানী তখনই সরকারকে ডেকে বজরায় যা চাল, ডাল আছে তা সবই ঐ লোকগুলির মধ্যে বিতরণ করতে বললেন। মা ভবানীর আদেশ—সরকার তখনই কাজে লেগে গেল।

যথেষ্ট চাল ডাল পেয়ে লোকগুলো খুশীমনে সেখান থেকে যেতে লাগল। যায় আর বলে, মা যেন রাণী ভবানী হয়েছে।

লোকগুলো জানত না যে স্বয়ং ভবানী-ই আজ তাদের অন্ন বিতরণ করলেন।

রাতের অন্ধকার কেটে যেতেই ভবানী বজরা চালাবার হুকুম দিলেন। নৌকা দুটোও বজরার পিছু পিছু চলল।

॥ বারো ॥

সিরাজের সিংহাসন চ্যুতির মন্ত্রণা কি কেউ ক্ষমা করতে পারে ? আজ যদি মীরজাফর উমিচাঁদের দল এসে সামনে দাঁড়ায় ? মাণিকচাঁদ কলকাতা লুণ্ঠনের সময় ভুরি ভুরি সোনা পকেটে ভরেছে। নবাব তাকে বন্দী করেছিলেন। মাণিকচাঁদ ভোলেনি সে কথা। দুর্লভ রায়ের উপরে নবাবের আজ্ঞায় মোহনলাল নজর রাখে। তাই দুর্লভ রায়ের রাগ। মীরজাফরকেও নবাব সন্দেহ করেন। জগৎ শেঠকে কাজে গাফিলতির জন্য প্রকাশ্য দরবারে অপমান করেন।

মন্ত্রণা সভা বসে জগৎ শেঠের অন্দরমহলে। নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তিনি বাংলার একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি তিনিও মন্ত্রণা সভায় যোগ দেন। নবাবের চেয়ে ইংরাজের দিকেই তার পাল্লাভারি। আর একজন আছেন এসবের পিছনে। মতিঝিল লুণ্ঠনের পর থেকেই তিনি ফণা উঁচু করে, সিরাজের মৃত্যুর ছিদ্রপথ খুঁজে বেড়াচ্ছেন, তিনি ঘসেটি বেগম।

ওয়াটসের কাছে ঘন ঘন দূত যায় গোপনে। ইয়ার লুৎফ খাঁ, উমিচাঁদ, খোজাপিত্রু সবাই আছে এই গোপন ষড়যন্ত্রে।

রাণী খবর শুনলেন ইংরাজরা যোগ দিলে যে কোন মুহূর্তেই বিদ্রোহ ফেটে পড়বে। ক্লাইভ সৈন্য নিয়ে তৈরী হয়ে আছে।

১লা মে ক্লাইভ ফিরে এলো কলকাতায়। অর্ধেক সৈন্য রেখে এলো চন্দননগরে। নবাবের সৈন্য ছাউনি ফেলেছে পলাশীতে। ইংরাজ লিখল নবাবকে আমরা তো সৈন্য ফিরিয়ে আনলাম আপনার সৈন্য এখনো পলাশীতে কেন? এই চিঠির সঙ্গে আর একটা গোপন চিঠি গেল ওয়াটসের কাছে। জাফর আলিকে বলো তিনি যেন কিছুতেই ভয় পেয়ে চলে না যান। আমি ঠিক সময়েই তাঁর সঙ্গে মিলব।

গুপ্তচর মতিরাম মারফৎ সিরাজ সব খবরই পেল। মীরজাফরকে হুকুম দিলেন পলাশী যেতে।

বিদ্রোহীরা ত্রিভুবন অন্ধকার দেখল। মীরজাফর মুর্শিদাবাদ ছাড়লে, সব গেল। আবার না গেলে নবাব সন্দেহ করবে। তাই টাল খেতে খেতে কোন রকমে সামলে নিয়ে মীরজাফর যাত্রা করল পলাশীর দিকে। কিন্তু ক্রাফটন নামে একজন ইংরাজ নবাবের মন ভিজিয়ে মন থেকে সন্দেহের কালো ছায়া মুছে দিল।

নবাব মীরজাফরকে পলাশী থেকে ফিরিয়ে আনল।

তারপর ?

তারপর ইংরাজ দরবারে মন্ত্রণা বসল, তৈরী হলো সন্ধিপত্র। সৃষ্টি হলো ক্লাইভের গর্দভ।

ঠিক হলো কোম্পানী পাবে— ১ লক্ষ টাকা।
ইংরাজ পাবে— ৫০ লক্ষ টাকা
দেশী বণিক ভাইয়ারা পাবে—২০ লক্ষ টাকা
আর্মেনীয়রা পাবে— ৭ লক্ষ টাকা
নৌসৈন্য আর স্থলবাহিনী পাবে—৫০ লক্ষ টাকা।

এছাড়া প্রধানদের পাওনা গণ্ডার কথা আলাদা।

গোল বাধাল উমিচাঁদ। গোঁ ধরে বসল কড়ায় গণ্ডায় ত্রিশ লক্ষ টাকা না দিলে সব চক্রান্ত ফাঁস করে দেবে।

উমিচাঁদ ধূর্ত। কিন্তু ক্লাইভ ধূর্তের শিরোমণি। উমিচাঁদ যায় ডালে ডালে, ক্লাইভ চলে পাতায় পাতায়।

উমিচাঁদকে ভাল করে অর্দ্ধচন্দ্র দেবার ব্যবস্থা হয়ে গেল। তৈরী হলো দুটি সন্ধিপত্র। একটি লাল একটি সাদা। আসলটি সাদা। লালটি জাল। জালিয়াত ক্লাইভের পক্ষে এ ছেলেখেলা। লালটাতে লেখা হলো উমিচাঁদের ত্রিশ লক্ষ টাকার কথা। জাল সন্ধিপত্রে ওয়াটসের সইটি জাল।

জুন মাসের চার তারিখে মীরজাফর সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করল।

—ঈশ্বর ও পয়গম্বরের নামে শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যতদিন জীবিত থাকিব এই সন্ধিপত্রের নিয়ম পালন করিব। এত গোপন করা সত্ত্বেও নবাবের গুপ্তচর খবরটি সংগ্রহ করে নবাবের কানে উঠিয়ে দিল।

মীরজাফরকে প্রায় নজরবন্দী করে সিরাজ সুযোগ খুঁজতে লাগল কবে মীরজাফরের প্রাসাদ আক্রমণ করা যায়।

ওয়াটস বেগতিক দেখে হাওয়া খেতে নিরুদ্দেশ হলো। সকলের অলক্ষ্যে একদিন টুপ করে সরে পড়ল। বলে গেল হাওয়া বদলাতে যাচ্ছে।

নবাবের সন্দেহ আরো বাড়ল।

ইংরাজদের লিখলেন,—

এই বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা আমি আগেই করেছিলাম। এজন্যই পলাশী থেকে আমি সৈন্য উঠিয়ে আনতে চাইনি। যাক আমার দ্বারা যে সন্ধি ভঙ্গ হয়নি এজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।

এ সময় নবাব নিজেকে খুব অসহায় বোধ করতে লাগল। দেশের প্রধানরা প্রায় সকলেই তার বিপক্ষে। মুখে নবাবের আনুগত্য দেখায় বটে কিন্তু ভেতরে ভেতরে ইংরাজদের সঙ্গে চক্রান্ত করে চলেছে।

নবাবের কোষাগারে তেমন অর্থ সঞ্চিত নেই। সৈন্যরা নিয়মিত বেতন পায় না। দু' চারজন রাজা-জমিদার তার পক্ষে আছে ঠিকই কিন্তু তারা তেমন অর্থ জোগাতে পারে না।

দেশের লোকের সহায়তায় ইংরাজদের আজ এত প্রতিপত্তি। যে ইংরাজরা ব্যবসা-বাণিজ্য করবার জন্য এদেশে শুধু কুঠি করবার অনুমতি পেয়েছিল তারাই এখন নবাবের মসনদ কেড়ে নিতে চায়।

নবাব বুঝল যে সে গোড়ায় ভুল করেছে। ইংরাজদের আস্কারা দেওয়া ঠিক হয়নি। ইংরাজদের স্পর্ধা দিন দিন যে বেড়েই চলেছিল তা তিনি লক্ষ্য করেননি।

এখন আর কোন উপায় নেই। মসনদ রাখতে হলে ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করতেই হবে।

কিন্তু কাদের ওপর ভরসা করে সিরাজ লড়াই করবে। সবাই তাকে ছেড়ে চলে গেছে। আছে কেবল মীরমদন আর মোহনলাল। বীর মোহনলাল। আর আছে ছায়ার মত লুৎফান্নেসা।

২২শে জুনের বিকাল থেকেই ইংরাজ সৈন্য গোপনে যেতে লাগল! রাত একটায় পলাশীর আমবাগানে এসে ঘাঁটি নিল। সে রাত ছিল ঝড়ের রাত। লক্ষবাগের চার পাশে একবুক উঁচু মাটির দেওয়াল। পাশে আছে খাল। এর কাছে নবাবের মৃগয়াগৃহ। ক্লাইভ ঝড়জল থেকে মাথা বাঁচাবার জন্য মৃগয়াগৃহে আশ্রয় নিল।

পরের দিন ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন বৃহস্পতিবার, ১১৭০ হিজরী পাঁচ সাওয়াল রোজ পঞ্চসোম্বা।

বেজে উঠল যুদ্ধের বাজনা। লক্ষবাগের গাছে গাছে হাওয়া বইছে, পাখি ডাকছে। বেলা আটটায় ফরাসী বীর সীনফ্রের কামান গর্জন করে উঠল দুম—দুম—দুউম—দুম।

ইংরাজের দিকে ৯৫০ জন গোরা, ২১০০ দেশী সিপাই, ৮টা কামান আর ২টা বড় তোপ।

নবাবের দিকে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য আর ৫৩টা কামান।

ইংরাজদের কামানও ডেকে উঠল। মাত্র আধ ঘণ্টা লড়াই হলো কামানে কামানে। ইংরাজের ১০জন গোরা আর ২০জন কালা সেপাই মারা গেল। ক্লাইভ দেখল আধ ঘণ্টায় ৩০জন মানে প্রতি মিনিটে একজন। এই 'রেটে' ইংরাজ সৈন্য মরতে থাকলে একদিনেই সব কটি সিপাইকে কবর দিয়ে রেখে যেতে হবে। ব্যাপার দেখে ক্লাইভ আমবাগানের আড়ালে গা ঢাকা দিল। নবাবের সৈন্য এগিয়ে এলো। ইংরাজরা আমবাগানের পাঁচিলের গর্ত কেটে কামান বসিয়ে আক্রমণ ঠেকাতে লাগল।

নবাবের পক্ষে যুদ্ধ করছে একা মীরমদন। অন্যেরা সব চুপ করে পটে আঁকা ছবির মত দাঁড়িয়ে।

'তীরে তীরে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি পড়ে রবে
একেলা মীরমদন বল কত নেবে সয়ে।
ছোট ছোট তেলেঙ্গাগুলি লাল কোর্তা গায়
হাঁটু গেড়ে মারছে তীর মীরমদনের গায়।'

বেলা এগারটা বাজল। বৃষ্টি নামল আকাশ ভেঙ্গে। বেশি নয় এক পশলা মাত্র। ইংরাজ সেনারা আমবাগানে। মাথার উপরে ঘন পাতার ছাউনি। নবাবের সৈন্য খোলা মাঠে। বারুদ ভিজে কাদা। ইংরাজদের গোলাগুলির তেমন কিছু হল না।

নবাবের কামানের মুখ একদম চুপ করে গেল।

মীরমদনের উৎসাহ তবুও কমেনি। কামানের মুখ চুপ করেছে বটে, যুদ্ধের মুখটি চুপ করতে দিল না। হঠাৎ একটা গোলা এসে লাগল মীরমদনের হাঁটুতে। আঘাত গুরুতর। মৃত্যুর ছায়া নেমেছে মুখের উপরে। ধরাধরি করে তাকে নবাবের শিবিরে নিয়ে আসা হলো।

মৃত্যুর কয়েক মুহূর্ত আগে জ্ঞান হলো মীরমদনের। নবাবকে জানাল প্রধান সেনাপতি জাফর আলির বিশ্বাসঘাতকতা। মীর-জাফর চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

সিরাজ মীরজাফরের পায়ের তলায় মাথার মুকুট রেখে সাহায্যের আবেদন জানাল। মীরজাফর কোরাণ হাতে নিয়ে শপথ করে সিরাজকে নিশ্চিন্ত করে নিজের শিবিরে ফিরে গিয়ে ক্লাইভকে চিঠি লিখল। কিন্তু চিঠি ক্লাইভের হাতে পৌঁছায়নি।

যুদ্ধে একটু ভাঁটা পড়েছে দেখে ক্লাইভ শিবিরে গিয়ে ভিজে পোষাক ছেড়ে একটু আরাম করে দু'চোখ একত্র করেছে, এমন সময় চীৎকার। ক্লাইভ উঠে বসল। শুনল মেজর কিলপ্যাটরিক হুকুম না নিয়েই ফরাসীদের আক্রমণ করেছে। প্রথমটা বিরক্ত হলেও পরে আরো কিছু সৈন্য নিয়ে কিলপ্যাটরিকের পিছু পিছু ছুটে গেল ক্লাইভ।

ফরাসীরা জোর যুদ্ধ আরম্ভ করল। তবুও ইংরাজ সৈন্য নবাব শিবিরের প্রায় দু'শ গজের মধ্যে এসে গেল। মোহনলাল মরিয়া হয়ে ইংরাজের আক্রমণ ঠেকাচ্ছে।

হায়! একা মোহনলাল আর কত ঠেকাবে! নবাবের অনেক সৈন্য হতাহত হয়েছে। ইংরাজরা ক্রমশই এগিয়ে আসছে।

নবাব সৈন্যদের উৎসাহ দিয়ে যুদ্ধের মোড় ঘোরাতে চাইলেন। কিন্তু কতক্ষণ! ইংরাজদের গোলার আঘাতে নবাবের সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল।

সিরাজ বুঝল তার সমুহ বিপদ। এখনই ইংরাজ সৈন্যরা এসে তাকে বন্দী করবে, হত্যাও করতে পারে।

একটা দ্রুতগামী হাতীর পিঠে উঠে সিরাজ মুর্শিদাবাদের দিকে পালালেন।

কোম্পানির নিশান উড়ল, জয় ডঙ্কা বাজল। ঠিক হল মুর্শিদাবাদ অভিযানে যাবে ইংরাজ আর মীরজাফরের সৈন্যরা। পথের মাঝে মীরজাফর সংবাদ পেল নবাব মুর্শিদাবাদ ছেড়ে পালিয়েছে। সঙ্গে আছে লুৎফান্নেসা বেগম।

মীরজাফরের গুপ্তচর ছুটল চারদিকে। সিরাজ তখন মালদহের মাঝখান দিয়ে মহানন্দ আর কালিন্দী বেয়ে বোড়াল গ্রামে গিয়ে একটি ছোট্ট কুটিরে আশ্রয় নিয়েছেন। জায়গাটা রাজমহল থেকে কয়েক ক্রোশ দূরে। মীরজাফরের গুপ্তচরেরা সংবাদটি মীরজাফরের কানে তুলল। বন্দী হল সিরাজ। মীরণের শোবার ঘরে আটকে রাখা হলো সিরাজকে।

তার পরের করুণ ঘটনা সবাই জানে। মুর্শিদাবাদে কেউ রাজি হয় না নবাবের বুকে ছুরি বসাতে। প্রলোভনে নয়, ভয়ে নয়। কেন? মীরজাফরের অর্থলোভ, ইংরাজের শয়তানী মুর্শিদাবাদ বাসীদের কাছে অজানা নাই। কিন্তু যে দেশে মীরজাফর আছে সে দেশে নিমকহারামেরও অভাব হয় না।

মহম্মদী বেগ এসে মীরণকে সেলাম করে দাঁড়াল। আমি আছি ছোট নবাব, আমার হাতে ছোরা দাও।

মুর্শিদাবাদের মানুষ ক্ষমা করেনি মহম্মদী বেগকে।

রাণীমা!

সম্বিত ফিরে পায় ভবানী।—তারা! তারা! যুক্তকর কপালে ঠেকায়।—উঃ! কি ভীষণ পরিবর্তন। নিজগৃহে পরবাসী!—দেশের মালিকানা গেছে বিদেশীর হাতে। উদগ্র লোভের লালসা আজ খালকেটে কুমীর এনেছে।

পাইক দাঁড়িয়ে ছিল।

—কি?

—মা, দেওয়ানজি আমাকে তাড়িয়ে দিলেন। আমি গরীব মানুষ, ছেলেপুলে নিয়ে কি উপোস করে মরব?

—কেন তাড়িয়ে দিয়েছেন?

—জানি না মা!

—আচ্ছা, তুমি যাও।

পাইক নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেল। মা'র কাছে এসে দাঁড়িয়েছে আর ভয় কি!

এখন কাজ থাক আর না থাক, যা ব্যবস্থা রাণীমাই করবেন।

দেওয়ানকে ডেকে পাঠালেন ভবানী।

বললেন, পাইকের কথা।

দেওয়ান বলল,—আপনার কাছে এসেছিল!

আসবে বইকি!—ভবানীর স্বর গম্ভীর। ছেলে বিপদে পড়লে মা'র কাছেই ছুটে আসে। ওকে কাজ থেকে ছুটি দিলেন কেন?

—কথা শোনে না মা!—

এই অপরাধ!—সে অপরাধে তাহলে আপনিও অপরাধী—ভবানী বললেন।

আমার কথা আপনিও শোনেন না।

দেওয়ানজি অবাক হয়ে তাকালেন।

—কাজে বহাল করবার সময় বিশেষ কারণ না হলে আমার অনুমতি নিতে হবে না। কিন্তু কাউকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিতে হলে আমাকে আগে জানাতে হবে একথা আপনার জানা। তাই না দেওয়ানজি? কিন্তু কই আপনি তো আমাকে জানান নি?

দেওয়ানজির মুখ লাল হয়ে উঠল। লজ্জায়।না অপমানে কে জানে। ভবানী বললেন, দেওয়ানজি! অবাধ্যকে বাধ্য করা শত্রুকে মিত্র করাই হলো মুন্সিয়ানা। বাধ্যকে অবাধ্য করতে মিত্রকে শত্রু করতে পারে সবাই। আপনি নাটোরের ডান হাত। সে হাতটি যদি দুর্বল হয় তাহলে নাটোরের দশা কি হবে?—আপনারাই আমার ভরসা। আপনাদের সহযোগিতায় এত বড় জমিদারির কাজ সুশৃঙ্খলে চলছে।

—কিন্তু মা অবাধ্যকের নিয়ে—!

দেওয়ানজি! আপনি এতবড় জমিদারি চালাচ্ছেন, আর একটা লোকের অবাধ্যতাকে ভয় করছেন? বনের বাঘকে যদি বশ করা যায়, তাহলে নাটোরের দেওয়ান আর একজন অবাধ্য পাইককে বশ করতে পারবেন না!

দেওয়ানজি লজ্জিত হয়ে চলে গেলেন।

এমনি করে দিন কাটে ভবানীর।—

উষা মুহূর্তে শয্যাত্যাগ করে ভবানী।

পূজা পাঠ করে স্নান আহ্নিক শেষ করে প্রার্থীদের দর্শন দেন। তারপর যায় রান্নাঘরে। নিজেই রাঁধে।

আহারের পরে আসে কর্মচারী আর প্রজারদল। তাদের সঙ্গে কথা বলে ভবানী। সুখ দুঃখের কথা। তারপর আবার জপ, তপ, ভাগবত পাঠ, গীতা, চণ্ডী।

রাতের সামান্য আহারটুকুও নিজেই গুছিয়ে নেন ভবানী। আড়ম্বর নাই, অহঙ্কার নাই শান্ত সমাহিত জীবন।

জনক ছিলেন রাজা তাই রাজর্ষি। ভবানী রাণী তাই রাজর্ষি নয়। আদর্শ ভোগের আসনে যোগী হয়ে বসা। মনে রেখো যোগের আসনে নয়, ভোগের আসনে। যোগী ভোগ পরিহার করে যোগের আসনে বসে যোগ করে। কিন্তু যে ভোগের আসনে বসেও যোগী—যোগিনী কথাটা তলিয়ে ভাব। তাকে তুমি কি বলবে?

তারাসুন্দরী ফেরে মায়ের পায়ে পায়ে। স্বভাবেও মায়েরই মত। সব হারিয়ে তারাসুন্দরী যৌবনে-যোগিনী। মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে যোগী ভবানীর মন যখন কেঁদে ওঠে, রাণী ভবানী হয়ে তখন সান্ত্বনা দেন। সব ভোগের বড় ভোগ স্বামী সংসার পুত্র-কন্যা, তাই যখন কপালে টিকল না, তখন আর কেন! সব কিছুই বিধির বিধান। তিনি যার যে ব্যবস্থা করে দেন তাই মাথা পেতে নিতে হয়। তিনি মঙ্গলময়, তিনি কাকে কি করেন, তিনিই জানেন। তাঁর বিচার করতে যেয়ো না। শুধু মাথা পেতে তাঁর বিধান মেনে নাও, তাঁর ইঙ্গিতটুকু বুঝে নাও, তারপর সেভাবে চল!

ভবানীর মেয়ে তাই ভবানী হয়ে উঠেছে। যারা রাণীমার কাছে আসে তারা, তারাদিদির সঙ্গেও দেখা করে যায়।

ভবানী পা দিল উনআশী বছরে। কিন্তু দেহটা সতেজ। বার্দ্ধক্য দেহে দাঁত ফুটিয়ে জীর্ণ করতে পারেনি।

সেদিন উষা মুহূর্তে উঠে স্নান করলেন ভবানী। তারাসুন্দরীকে ডেকে হাতে দিলেন পূজার নির্মাল্য। তারপর চলে গেলেন পূজার ঘরে। রোজই যান। কিন্তু আজ যাবার আগে মেয়েকে মাথায় হাত বুলিয়ে নীরবে আশীর্বাদ করে গেলেন।

তারাসুন্দরী একটু অবাক হলো। কই মা'তো কখন এমন

করেন না। তারাসুন্দরীর মন বুঝি একটু চঞ্চল হলো, মায়ের দৃষ্টি যেন কেমন উদাস। যেন সংসারের সঙ্গে কোন যোগ নেই।

একটু একটু করে বেলা বাড়ছে।

তারাসুন্দরীর মনের শঙ্কা বাড়ল। মা'তো কখন এত দেরি করেন না। সব কাজই নিয়ম বাঁধা, সময় কাটা। একটা অজানা শঙ্কা তারাসুন্দরীকে আশঙ্কিত করে তুলল!

দরজার বাইরে কান পেতে দাঁড়াল তারাসুন্দরী। কিন্তু কোন সাড়া নাই কেন?

হঠাৎ তারাসুন্দরী চমকে উঠল একি! মা তো কখনো এমন ভাবে ডাকেন না!

একবার ভাবে ভিতরে যাই। আবার ভাবে হয়ত বিগ্রহের কোন বিশেষ আরাধনায় মা ব্যস্ত।

দরজার বাইরে কান পেতে দাঁড়িয়ে আছে তারাসুন্দরী।

হঠাৎ তারা তারা, শুনে চমকে উঠল। ডাক শুনে তারাসুন্দরী দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল।

ভবানী শুয়ে আছেন বিগ্রহের পায়ের নীচে। স্থির হয়ে আছে চোখের তারা। দেহটি নিষ্পন্দ। কেঁদে উঠল তারাসুন্দরী।—মা, মা আমি—চেয়ে দেখ—

কাকে ডেকেছিলেন ভবানী, বোধহয় মেয়েকেই, বোধহয় ইষ্টদেবীকে, কেউ জানে না শেষ কথা তিনি কাকে বলে গেলেন।

বড়নগরের গঙ্গাতীরে উঠল হাহাকার। প্রজারা কেঁদে উঠল,—আমরা মাতৃহারা হলাম। কর্মচারীরা নীরবে চোখ মুছল।

শুধু তারা বসে রইল স্তব্ধ হয়ে।

এখনও মায়ের ডাক কানে বাজছে—তারা তারা। মায়ের যে এই শেষ ডাক কেমন করে জানবে তারা?—জানতেন একমাত্র ইষ্টদেবী তারা।

—শেষ—